স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ ও সমাজ জাগরণ — পৃঃ ১১

সময়ের আহ্বানে ধর্মযোদ্ধা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য —পৃঃ ৪১

৭০ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা।। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।। ১৩ ফাল্গুন - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ১৩ ফাল্গুন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২৬ ফেব্রুয়ারি - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

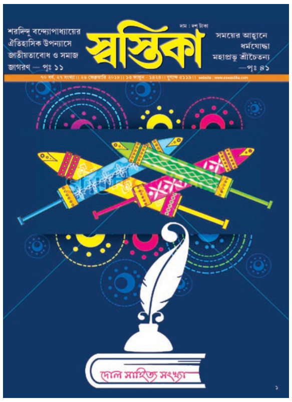

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

ত্রিপুরায় বিজেপির উত্থানে সঙ্কটে বামেরা
▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৬

খোলা চিঠি : ফেবু আমায় ডুবাইল রে, আমায় ভাসাইল রে...
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

বাংলার নিম্নবর্গ উৎস সম্পর্কে তিনটি তত্ত্বকাঠামো
▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ৮

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ ও সমাজ জাগরণ ▯ সুদীপ বসু ▯ ১১

ভালোবাসার খোঁজে ▯ রমানাথ রায় ▯ ১৯

বুরুজ ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ২৩

হার্ডিঞ্জ সাহেবের ঘড়ি ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ২৭

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশী সংগীত
▯ মালিনী চট্টোপাধ্যায় ▯ ৩১

পাড়াইজম ▯ ভবেন্দু ভট্টাচার্য ▯ ৩৪

বিহারীলাল ও সেইসময়
▯ অভিজিৎ দাশগুপ্ত ▯ ৩৫

জাগো নিমাই পণ্ডিত
▯ ড. জিষ্ণু বসু ▯ ৩৮

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সব কা সাথ, সব কা বিকাশ

স্বাধীনতার পর গত সত্তর বছরে ভারতে ‘বিকাশ’ কথাটি ছিল রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা বিশেষ। কোনও রাজনৈতিক দলই বিকাশকে তাদের মূল লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করেনি। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর নরেন্দ্র মোদী অগ্রাধিকার দিয়েছেন সাধারণ মানুষকে। সেই সূত্রেই দেশ পেয়েছে জনধন যোজনা, উজ্জ্বলা প্রকল্প, স্বাস্থ্যবিমা। মোদী সরকারের লক্ষ্য, ‘সব কা সাথ, সব কা বিকাশ।’ স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিকাশমুখী কর্মসূচীর নানা দিক নিয়ে পর্যালোচনা। লিখবেন কুণাল চট্টোপাধ্যায়, প্রণয় রায় প্রমুখ

দাম একই থাকছে — ১০.০০ টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

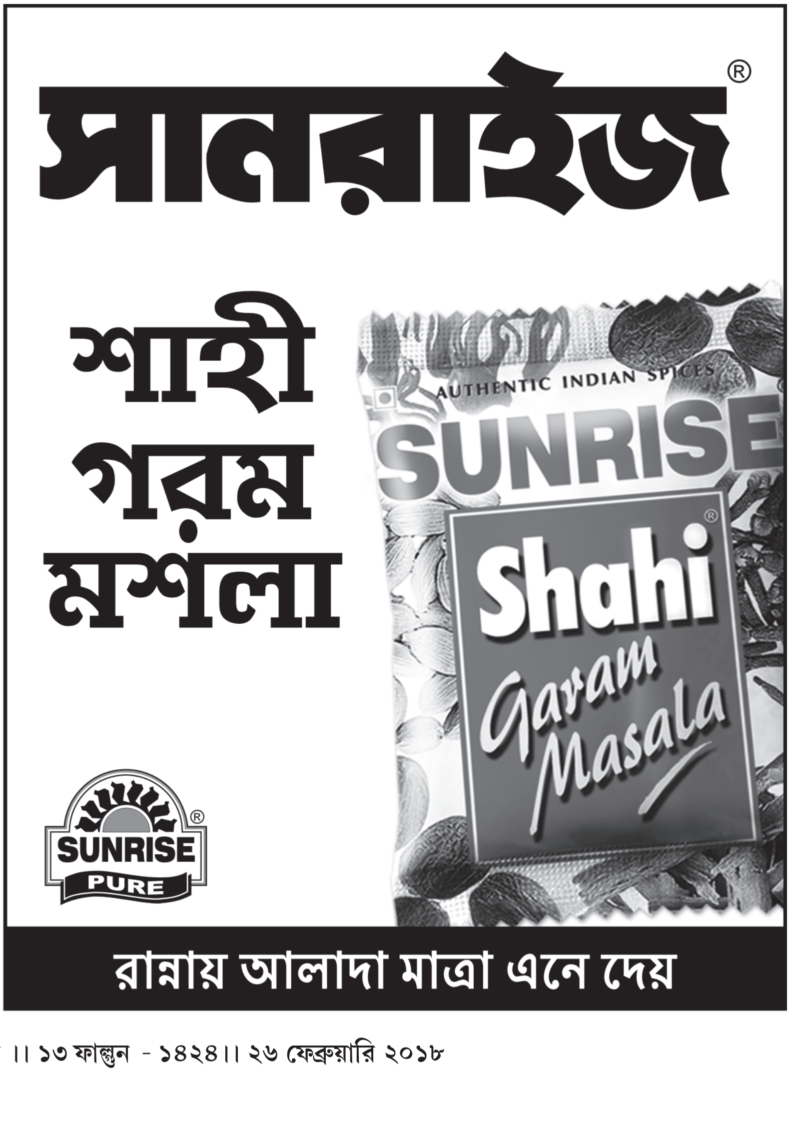

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দোল সমরসতার উৎসব

দুর্গাপূজা, দীপাবলী, দোল—ভারতীয় জীবনচর্যায় অন্যতম তিন উৎসব। বসন্ত ঋতুর সমাগমেই অনুষ্ঠিত হয় দোল। এই সময় দিন রৌদ্রকিরণোজ্জ্বল। নির্মল নীল আকাশ। বিদায় লইয়াছে উত্তরের হিমেল হাওয়া। তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে দখিনা বাতাস। গাছে গাছে কচি পাতা। রঙবেরঙের ফুল। পলাশের বনে যেন আগুন। মধুলোভী ভ্রমরের আনাগোনা। পক্ষীকুলের কিচির-মিচির। মেঘের কোলে মুক্ত বিহঙ্গের দল। কোকিলের কুহু কুহু ডাক। সব মিলাইয়া প্রকৃতির এক মোহময় রূপ। বসন্ত সত্যিই ঋতুরাজ। এই রাজদরবারে সবারই আমন্ত্রণ। প্রকৃতির এই অপরূপ রূপই মনোজগৎকে দেয় দোলা। সৃষ্টি হয় রসের। নিত্য বৃন্দাবনে রসিকরাজ কৃষ্ণ সেই রস আস্বাদনে রাঙাইয়া দেন শ্রীমতী রাধাকে। সকলকেই রাঙাইয়া দিয়া আপন করিয়া গ্রহণ করিতে চায়। রসোল্লাসে মাতিয়া উঠে বিশ্বপ্রকৃতি। সাহিত্যেও তাহার প্রতিফলন। সেই রসবোধে 'শুষ্কং কাষ্ঠং' হইয়া উঠে 'নীরস তরুবর।' প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করিয়া যাহা অসীমকে স্পর্শ করিতে চায়। রঙ রূপান্তরিত হয় রসে—সাহিত্যে। 'রস বৈ সঃ।' রস সৃষ্টির আনন্দে সকল ভেদরেখা মুছিয়া যায়। সাহিত্যের ভোজে তাই সবারই আমন্ত্রণ। প্রান্তিক মানুষও বাদ যায় না। রবিকবির 'ঐক্যতান'-এ তারই প্রকাশ—'একতারা যাহাদের তাহারাও সম্মান যেন পায়।' বস্তুত সেই সুদূরকাল হইতে ভারতীয় সাহিত্যে কেহই ব্রাত্য নহেন। চণ্ডাল গুহক, বনবাসী শবরী, নাগকন্যা উলূপী, একলব্য, ঘটোৎকচ, পিতৃ-পরিচয়হীন সত্যকাম—সকলেই স্থান পাইয়াছে। বিদেশি শাসনে ভীতগ্রস্ত ভারতীয় সমাজ কূর্মবৃত্তি অবলম্বনের কারণে জাতপাত, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, আচার-বিচারের ভেদরেখা চিহ্নিত করা হইয়াছিল ঠিকই, তবে তাহা তাৎকালিক। কেননা ভারত সর্বদাই 'সত্য'-এর উপাসক, ব্যাখ্যা তাহার যাহাই হউক না কেন। দোল তাই রসের, আনন্দের, সাহিত্যেরও উৎসব। এখানেই দোল-এর মাহাত্ম্য।

আরও এক দিক হইতে দোল পূর্ণিমা তাৎপর্যময়। এই পুণ্য তিথিতেই পূর্ণচন্দ্রোদয়—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। ভক্তিকেই যিনি শক্তিতে পরিবর্তন করিয়াছিলেন। 'নাম'-ই তাঁহার অস্ত্র। যোল শব্দ বত্রিশ অক্ষরের 'হরেকৃষ্ণ...হরে রাম'-এর সেই আয়ুধে সকল ভেদাভেদ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। কে নেই সেই নাম সংকীর্তনে? ব্রাহ্মণ অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম, ধর্মান্তরিত রূপ ও সনাতন, যবন হরিদাস আর অগণিত ভক্তজন। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। তৎকালীন বঙ্গ সাহিত্যেও তার প্রতিফলন। ষোড়শ শতাব্দী হইয়া উঠিয়াছে বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ। বস্তুত ভারত জুড়িয়া সেই কালখণ্ডে ভক্তি আন্দোলনের ধারা—নানক, কবীর, রুইদাস, তুলসীদাস, জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম, রায় রামানন্দ, তিরুবল্লুবর, নারায়ণ গুরু—এক দীর্ঘ তালিকা। সমরসতার, সহমর্মিতার সৃষ্টির এক অপূর্ব প্রয়াস।

সেই প্রয়াস অব্যাহত। 'বর্তমান ভারত'-এ স্বামীজীর আহ্বান—'ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই'। রঙ আর আবির এই ভাব প্রকাশের এক সার্থক উপকরণ। ভোট শিকারিদের মণ্ডল-কমণ্ডলু-র রাজনীতি আজ তাই ক্রম-অপস্রিয়মাণ। রামজন্মভূমিতে মন্দিরের শিলান্যাসে এক অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। জাতপাতের রাজনীতিকে পর্যুদস্ত করিয়া মুখ্যমন্ত্রীর আসনে আজ যোগী আদিত্যনাথ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গিরিবাসী-বনবাসী মানুষরাও আজ আত্মপ্রত্যয়ী। সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে তাহাদের গৌরবোজ্জ্বল উপস্থিতি। সমাজের সর্বস্তরে এই সমরসতা, সহমর্মিতার প্রকাশ অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত। দোল এই শুভবোধ জাগরণের এক উৎসব।

সুভাষিতম্

কর্মণা রহিতং জ্ঞানং পঙ্গুনা সদৃশং ভবেৎ।

ন তেন প্রাপ্যতে কিঞ্চিৎ ন চ কিঞ্চিৎ প্রসাধ্যতে।।

কর্ম রহিত জ্ঞান পঙ্গু অর্থাৎ নিরর্থক হয়ে থাকে। তার দ্বারা কোনও বস্তু লাভ করা যেতে পারে না এবং কোনও কাজও সিদ্ধ করা যায় না।

ত্রিপুরায় বিজেপির উত্থানে সঙ্কটে বামেরা

ত্রিপুরা বিধানসভার ভোট শেষ। ফল জানা যাবে ৩ মার্চ। কৌতূহলের বিষয়, মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নেতৃত্বে ত্রিপুরায় অষ্টম বাম সরকার গঠিত হবে কি না। পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পারেননি। সিপিএমের অশ্বমেধের ঘোড়া আটকে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিপিএমের অষ্টম বাম মন্ত্রীসভা গঠনের স্বপ্ন বাস্তব হয়নি। বুদ্ধবাবু এবং তাঁর পার্টি নেতারা মনে করেছিলেন মানুষের থেকে পার্টি বড়। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে তিন ফসলি কৃষিজমি কেড়ে নিতে তাই মার্কসবাসীদের বিবেক বাধা হয়নি। একবারও মনে হয়নি মানুষ মরলে পার্টিও মরবে। সাধারণ মানুষের জন্য পার্টি। এই কথাটাই সিপিএম নেতারা ক্ষমতার দম্ভে ভুলে গিয়েছিলেন। ত্রিপুরায় ভোটের আগে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মতো ঘটনা ঘটেনি। তবে এই প্রথম জনসমর্থনের বিচারে বিজেপির উত্থান চিন্তায় ফেলেছে মানিক সরকারদের। বিজেপি এবং আই পি এফ টি জোট এবার জোর টক্কর দিয়েছে বামেদের বিরুদ্ধে। এমন জোরালো চ্যালেঞ্জ অতীতে বিরোধীরা দিতে পারেনি। কংগ্রেস এবং তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রভাব বা সংগঠন কিছুই নেই। এই দুই সাইনবোর্ড সর্বস্ব দলের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল।

ত্রিপুরায় সিপিএম জিতবে কি না সে আলোচনায় না গিয়েও বলা যেতে পারে পার্টির নেতাদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্কলহ দেখে বোঝা যায় যে শৃঙ্খলাবোধ এবং রাজনৈতিক আদর্শ এখন অতীতের ইতিহাস। দিল্লিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিপিএম পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে বিজেপি এবং কংগ্রেস দুটি দলই ফ্যাসিবাদী। এদের রুখতে সিপিএম বাম গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে জোট করতে পারে। বাঙালি কমিউনিস্টদের একটা বড় অংশ কংগ্রেসকে ফ্যাসিস্ট পার্টি বলতে চায় না। তাঁরা মনে করেন, বিজেপি স্বৈরতান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক দল। কিন্তু কংগ্রেস ক্ষমতালোভী কর্পোরেট অনুগামী হলেও, সাম্প্রদায়িক দল নয়। বামপন্থীদের এই তাত্ত্বিক কচকচানিতে সাধারণ মানুষ খুব

গূঢ় পুরুষের

কলম

একটা মাথা ঘামায় না। বিগত দুই দশক ধরে সিপিএম নেতারা আলোচনা করেছেন বিজেপি না কংগ্রেস বড় শত্রু কে? আজও তাঁরা সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। বাঙালি মার্কসবাদীরা মনে করেন, বিজেপি বড় শত্রু। কেরালার কারাটপন্থীরা বিশ্বাস করেন কংগ্রেস স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট দল। দিল্লির পার্টি কংগ্রেসে রাজনৈতিক প্রস্তাবের উপর বিতর্ককে ঘিরে যে নোংরা কাদা ছোঁড়াছুড়ি নেতারা করেছেন তাতে স্পষ্ট যে দলে এখন শৃঙ্খলা বলে আর কিছুই নেই। চলতি বছরেই সিপিএম পার্টি দু' টুকরো হলে অবাক হবেন না। মোদী সরকারকে ২০১৯-এর ভোটে হারাতে মমতার জোটের রাজনীতিতে কেরালার মার্কসবাদীরা যোগ দিলেও বাঙালি মার্কসবাদীরা কখনই সেই জোটে যাবেন না। তাঁরা মনে করেন মমতা তাঁদের এক নম্বর রাজনৈতিক শত্রু। কেরল ও ত্রিপুরার নেতারা তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধিতায় অটল। তাঁরা কংগ্রেসকেই প্রধান শত্রু বলে মনে করেন। আর পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট নেতারা মমতা বিরোধিতায় কংগ্রেসের হাত ধরার পক্ষে। তাই বলছি, সারা দেশে বামেরা এখন মহাসঙ্কটে পড়েছে। চলতি বছরেই দেখবেন সিপিএম (বেঙ্গল), সিপিএম (কেরল) এবং সিপিএম (ত্রিপুরা) নামে পার্টি গজিয়ে উঠেছে। যেমন, চারু মজুমদার-কানু সান্যালদের নকশাল পার্টি ভেঙে জনযুদ্ধ, লিবারেশন, মাওবাদী-লেনিনবাদী ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়েছে।

ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির অবক্ষয়ের ইতিহাস বিচিত্র। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে দেশের ৪৯টি আসনে লড়ে ১৬টি আসন পেয়েছিল বামেরা। পশ্চিমবঙ্গে জিতেছিলেন পাঁচজন বাম প্রার্থী। এমনকী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শহিদের মৃত্যুবরণ করলে তাঁর দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতার আসনটির উপনির্বাচনে কমরেড সাধন গুপ্ত জিতেছিলেন। তখন বামপন্থীরা কংগ্রেস বিরোধী রাজনীতি করতেন। এই বিরোধিতায় অনৈক্য ছিল না। সকলেই মনে করতেন কংগ্রেস পুঁজিবাদের তল্পিবাহক। তারপর লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত খিচুড়ি রাজনীতির জন্ম হলো। দেশজুড়ে কমিউনিস্টরা পরস্পর পরস্পরকে গালিগালাজ করতে শুরু করলো। মনে থাকার কথা যে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ক্যাডাররা যত নকশাল যুবককে হত্যা করেছিল তত সিদ্ধার্থ রায়ের পুলিশ করেনি। ভুল রাজনীতি বামেদের জনবিচ্ছিন্ন করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কমিউনিস্টরা রুশপন্থী, চীনপন্থী হয়েছেন। কিন্তু কোনওদিন ভারতপন্থী হতে পারলেন না। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে তত্ত্বকথা আউড়ে গেলেন। গণতন্ত্রের লম্বা চওড়া কথা বলে পশ্চিমবঙ্গে পার্টিতন্ত্র কায়েম করেছিলেন। মানুষের চেয়ে বড় মনে করেছেন পার্টিকে। আজ সেই ভুলের খেসারত দিচ্ছেন তাঁরা। ■

ফেবু আমায় ডুবাইল রে, আমায় ভাসাইল রে...

অকূল দরিয়ায় বুঝি কূল নাইরে...

সত্যিই কোনও কূলকিনারা নেই। বাঙালি ডুবছে। বাঙালি ভাসছে। নীল-সাদায় চলছে ভাসা, ডোবার খেলা। না, এ মমতাদিদির নীল-সাদা নয়, এ হলো মার্ক দাদার নীল-সাদা। ভাল নাম ফেসবুক আর আদরের নাম ফেবু। সেই ফেবু এখন বঙ্গ নেটিজেনদের ভিতরে, বাহিরে, অন্তরে, অন্তরে।

সেই নেটিজেন কারা? না, আর ওয়াই জেনারেশন বলা যাবে না। রিটায়ার্ড দাদু থেকে দুই বাচ্চার মা সবাই ফেবুতেই হাসে, ফেবুতেই কাঁদে। রান্না হয় ডাল-ভাত, ছবি যায় কালিয়া-কোপ্তার। দাম্পত্যও ফেবুতে বাঁধা। নিয়মমাফিক আদর-টাদর মিটে গেলেই যে যার ফেবু জগতে। অন্ধকার ঘরে জন্মজন্মান্তরের দুই সঙ্গীর মুখে চোখে— নীল-সাদা আলো। আঙুল সরে সরে যায় পোস্ট থেকে পোস্টান্তরে। খ্যাপার মতো খুঁজে ফেরে লাইক রতন। বাঙালি রাত জেগে লাইকায়, শেয়ারায়, কমেন্টায়। ইমোজিতেই মজে থাকে।

সংসার ভেসে যায়। সংসার ভেঙে যায়। সে যায়, যাক। কিন্তু ফেবু কচলানোর স্বাধীনতায় হাত দেওয়া যাবে না। আমরা স্বাধীন। আমাদের ফেবু স্বাধীনতায় হাত দেওয়ার অধিকার কারোর তো নেইই, মত দেওয়ারও নয়। না পোষালে ছেড়ে দাও। এখনও হিসেব তৈরি হয়নি। সমীক্ষা চালালে সংসার ভাঙায় ফেসবুকের ভূমিকা, বিশ্ব উষ্ণায়নের ভয়কেও হার মানাবে নিশ্চিত।

বন্ধুরা সব ভার্চুয়াল। প্রতিবেশীরাও ভার্চুয়াল। সবার সঙ্গে সবার যোগ এক পাতায়। রোগীকে দেখতে হাসপাতালে না গেলেও চলে। শুধু স্ট্যাটাসে কমেন্ট দিয়ে দাও। কদিন পরে শ্মশানযাত্রীও হবে ভার্চুয়াল। শ্রাদ্ধের ভার্চুয়াল নিমন্ত্রণপত্র তাদের কাছেই যাবে যারা মৃতের মৃত্যু স্ট্যাটাসে RIP লিখেছিলেন।

এই বাঙালি ভাগ্যিস স্বাধীন! তা না হলে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে লাইক দেখে ব্রিটিশকে বুঝতে হতো ব্যাপারটা সহজ নয়। সতীদাহ প্রথা বন্ধ নিয়ে রাজা রামমোহন রায় কিংবা বিধবাবিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগর মশাইকে পোস্ট করতে হতো ফেসবুকে। তা না হলে, বাঙালিকে শোনাবেন কী করে!

এ বাঙালি শুধু এপারে নয়, ওপারেও। একুশে ফেব্রুয়ারিতে ফেসবুকে যত পোস্ট হয়, তত মানুষ বাংলা বই পড়ে না। ধরা যাক ১৯৭১ সালে ফেসবুক রয়েছে। তবে কেমন হতো ভাষা আন্দোলন! নিশ্চিত 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' নামে কোনও পেজ ক্রিয়েট হতো। তার অ্যাডমিন ইনভাইট করতেন বাংলাপ্রেমীদের। কেউ কেউ শেয়ার করতেন পেজ। চলত তুমুল আলোচনা। অবশ্যই বাংলায়। আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করতে নানা মতে ভরে উঠত কমেন্ট সেকশন। গুলি চলত না। কেউ শহিদ হোত না। বানাতে হতো না শহিদ মিনার। একুশে নামে কোনও তারিখই থাকত না বাঙালির।

কিন্তু, এই বাঙালি বাঙালিই তো? মানে তাদের পিতৃদত্ত, অন্নপ্রাশনলব্ধ নাম ঠিকই থাকছে, শিক্ষা-দীক্ষা, গার্লফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ডের সেজকাকা একেবারেই অপরিবর্তিত থাকছেন, বাঙালির ডিসপেপসিয়া, দাদ-হাজা-চুলকানি যেমন থাকার তেমনটাই থাকছে, সকালের কোষ্ঠকাঠিন্য, বিকেলের মুড়ি-তেলেভাজাতেও কোনও পার্থক্য থাকছে না, কিন্তু কোথাও যেন তাল কাটছে, ঘেঁটে যাচ্ছে বাঙালির এমন একটা কিছু, যা লোকেট করা যাচ্ছে না। বাঙালি আপিস যাচ্ছে, বাজারে ইলিশের ভাও নিয়ে খুঁত খুঁত করছে, মধ্যবয়স জিনসের ফিফথ পকেটে গুঁজে আড় চোখে মেট্রোর দরজার সামনে দণ্ডায়মানা আওয়ারগ্লাস ফিগারের খুল্লমখুল্লা সৌদামিনীর ঘাড়ের কাছে চাঁদের কলঙ্কের মতো ট্যাটু দেখছে।

কিন্তু মাঝে মাঝেই মনে পড়ছে সকালে ফেসবুকে দেওয়া আপডেটের কথা। কত লাইক এল, কত শেয়ার! কেউ ননভেজ কমেন্ট করেনি তো! কৌতূহলের লোভ সামলাতে না পেরে হ্যান্ডেল ছেড়ে মোবাইল খুলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েও উঠে দাঁড়াচ্ছে বাঙালি। বাঁচতেই হবে, ফেসবুকের জন্য বাঁচতে হবে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দিয়ে যেতে হবে স্ট্যাটাস। প্রতিদিনের হুজুগে নিজেকে গুঁজে দিতেই হবে। শ্রীজাতর 'কন্ডোম কবিতা' থেকে প্রিয়া প্রকাশের 'চোখ-মারা' সবেতেই দিতে হবে মত। তবেই না মিলবে লাইক নামক অরূপরতন।

এসব দেখে মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে—এই বিশ্বের নাবালকতম প্রাণী কি বাঙালি? নাকি, শিং ভাঙা বাছুর?

—সুন্দর মৌলিক

বাংলার নিম্নবর্গ উৎস সম্পর্কে তিনটি তত্ত্বকাঠামো

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

বাংলার ব্রাত্য মানুষ প্রান্তিক অস্পৃশ্য খেটে খাওয়া মানুষ— তাদের পরিচয় আদি কথা সম্পর্কে সামান্য কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন দুই বুদ্ধিজীবী সন্ধানী— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬.৬.১৮৩৮- ৮.৪.১৮৯৪) আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (৬.১২.১৮৫৩-১৭.১১.১৯৩১)।

এই লেখায় তার সঙ্গে মিলিয়ে নেব স্বামী বিবেকানন্দ (১২.১.১৮৬৩-৪.৭.১৯০২) -এর উদার সাংস্কৃতিক সমাজ-সম্পৃক্ত ধর্মচেতনা, যা অস্পৃশ্য দরিদ্র লাঞ্ছিত, জীবননিষ্ঠ শূদ্র সমাজকে সমাজের প্রকৃত চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছেন, ভারতে আর্য ভাষাভাষীদের ক্রমিক পূর্ব ও দক্ষিণ দিশায় অগ্রসর হওয়ার ইতিহাস থেকে উক্ত জনগোষ্ঠীগুলির বিশেষ নির্দিষ্টতা প্রদান, কেন্দ্রাতিগ হবার প্রক্রিয়াতে সমর্থন বা দূরবর্তী প্রান্তিকতার দিকে সরে যাবার সাধ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। সমাজ গঠন ও স্তরভেদের ধারণা, মধ্যযুগীয় স্মৃতিশাস্ত্রগুলির উপর নির্ভর করে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। অবশ্য দশম শতাব্দীতে বল্লাল সেনের নামে প্রচলিত স্মৃতি বা সামান্য কিছু আগে পরে রচিত ভবদেব ভট্টের রচনা, ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের স্মৃতিগ্রন্থের উপর বঙ্কিমচন্দ্র নির্ভর করেননি— কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক, উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রস্তাব সাজিয়েছেন।

১৮৮১-১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ পায় 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' আর 'বাঙ্গালার ইতিহাস'। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন :

'আমরা দেখিতেছি না যে, অগৌরবের কিছু হইল। আমরা সেই প্রাচীন আর্যজাতি সম্ভূতই রহিলাম— বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমদিগের পূর্বপুরুষগণ সেই গৌরবান্বিত আর্য। আর্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ কিছু মহৎকীর্তি রাখিয়া যান নাই— আর্য কীর্তিভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল! এখন দেখা যাইতেছে যে, আমরা সে কীর্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী। সেই কীর্তিমন্ত পুরুষগণই আমাদিগের পূর্বপুরুষ। দোবে, চোবে, পাঁড়ে, তেওয়ারীর মতো আমরাও ভারতীয় আর্যগণের প্রাচীন যশের ভাগী বটে।' (বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার : দ্বিতীয় প্রস্তাব; বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ ব.)। বলা বাহুল্য, এই গৌরববোধ অব্রাহ্মণ বাঙালির হওয়া অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র সেজন্যই তাঁর যুক্তি অন্যভাবে সাজিয়েছেন। খুঁজেছেন বঙ্গ সমাজে আর্য-উপাদান। বঙ্কিম 'বাঙালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন 'কায়স্থ প্রভৃতি' জাতি শূদ্র হলেও তারা 'আর্যবংশীয়।' অম্বষ্ঠ তথা বৈদ্যরাও আর্য। কারণ অবিমিশ্র আর্য ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের সংকর তারা। আর চণ্ডাল জাতি 'আর্য-অনার্য উভয় কুলজাত।'' (বাঙালির উৎপত্তি'; 'বঙ্গদর্শন'; জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ ব.)।

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন : 'যে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই— সে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়া হিন্দু সমাজে মিশিতে পারে না।' অতি সম্প্রতি বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এই ধরনের ধারণার বশবর্তী হয়েই বলেছেন হিন্দু ধর্মে 'ধর্মান্তরণ নেই।' এটুকু জানেন তিনি! বঙ্কিমচন্দ্র যে একথাও লিখেছেন, দলবদ্ধ ভাবে যদি কোনো গোষ্ঠী বা পরিবার হিন্দু ধর্মের পূজা পদ্ধতি অনুকরণ করতে থাকে— 'জীবন নির্বাহের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম সকলে হিন্দুদিগের ন্যায় আচরণ করিতে আরম্ভ করিতে' থাকে; আর 'সমগ্র জাতি এই রূপ ব্যবহার করতে থাকলে 'কালক্রমে তাহারাও হিন্দু নাম ধারণ করিবে।' এই পদ্ধতিকে

বিশিষ্ট সমাজ তাত্ত্বিক ড. এম. এন. শ্রীনিবাস 'Sanskritization' নামে অভিহিত করেছেন। ক্রমে এদের সমাজে প্রান্তিক অবস্থান নির্দিষ্ট হবে। বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়টি নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন। তাঁকে ভোটব্যাঙ্কের কথা ভাবতে হয়নি, যা সত্য তাই স্পষ্ট ভাবে বিচার ও প্রচার করার প্রত্যয় সাহিত্য সম্রাটের ছিল। তিনি লিখেছেন :

'অন্য হিন্দু কেহ তাহাদিগের অন্ন খাইবে না। তাহাদিগের সহিত কন্যা আদান-প্রদান করিবে না, অথবা অন্য কোনো প্রকারে তাহাদিগের সহিত মিশিবে না— হয়ত তাহাদের স্পৃষ্টজল পর্যন্তও গ্রহণ করিবে না। অতএব তাহারাও একটি পৃথক হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইবে।' ('বঙ্গদর্শন' চৈত্র; ১২৮৭ ব.)

অস্পৃশ্য জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে, এই বঙ্কিমের ধারণা।

স্বামী বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত স্বীকার করেননি। তাঁর ভাবাদর্শ আমাদের পরিচিত। সেই উদার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কথা আমরা জানি, জানি তাঁর অন্ত্যোদয়ের প্রকল্প। যখন তিনি 'উদ্বোধন'- পত্রিকায় লেখেন : আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর; আর যতই কেন তোমরা 'ডম্মম্' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্ছ তোমরা।' ('পরিব্রাজক'; 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা'; উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা; ৬ষ্ঠ খণ্ড; চৈত্র ১৩৮৩; ২৭ তম পুনর্মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২৩ ব.; ৬৪ পৃ.)। বাংলার পাঠক এ কথাগুলির সঙ্গে আকৈশোর পরিচিত। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের তাত্ত্বিক কাঠামোটি ভেঙে দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আর্য পূর্বপুরুষদের গৌরব প্রচার করতে চাননি। 'চলমান শ্মশান' বলা হতো চণ্ডাল-পারিয়া প্রভৃতি নিম্ন বর্ণের জনসত্তাগুলিকে। 'মনুসংহিতা'-য় তাদের অস্পৃশ্য ভাবা হয়েছে। প্রচুর অমানবিক নির্দেশ দেওয়া আছে। স্বামীজী এই নিষ্ঠুর সমাজ বিধানকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর কল্পদৃষ্টিতে এই অবস্থানের পরিবর্তন আসন্ন--- 'শূদ্র যুগ' অদূর ভবিষ্যতের ভারতবর্ষের অনিবার্য নিয়তি। আর একবার স্বামীজীর মন্তব্য তুলে ধরা চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের 'রাজা মহারাজা' স্বামী ব্রহ্মানন্দ (১৮৯২-১৯২২)-কে শিকাগো থেকে ১৮৯৫-তে লেখা একটি বিখ্যাত চিঠির একাংশ উল্লেখ করছি :

'If there is inequality in nature, still there must be equal chance for all– or if greater for some and for some less– the weakes should be genew chance than the stronger.

অর্থাৎ চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত আবশ্যক ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের অবিশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশ জনের আবশ্যক। কারণ তাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম। The poor, the downtrodden, the ignorant, let these be your God ?

('পত্রাবলী', ১৫৯-সংখ্যা; 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'; সপ্তম খণ্ড; উদ্বোধন কার্যালয়; চতুর্থ সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৮৪; ২৬তম পুর্নমুদ্রণ আষাঢ় ১৪২৩ ব.; ৭২ পৃ.)।

নিম্নবর্ণের জনসত্তাকে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারলে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিলে ভারতবর্ষ নতুন এক ক্রান্তিলগ্নে উপনীত হবে। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছেন জাতিভেদ লুপ্ত হোক। তবে তিনি ড. আম্বেদকর (১৪.৪.১৮৯১—৬.১২. ১৫৫৬)-এর মতো জাতপ্রথা ধ্বংস করার (তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Annihiletion of Caste'-১৯৩৬) প্রস্তাব দেননি। স্বামীজী মনে করতেন, জাতিভেদ বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর ভারতে সমাজ শরীরে যে জটিল বিভ্রম তৈরি করেছিল, সামাজিক সফলতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় তার ফলে। সামাজিক সচলতা (Social Mobility) ছিল বর্ণ ব্যবস্থায়। এ

কেবল ভারতের ক্ষেত্রে নয়। 'মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে চারিটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়— পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), জৈবিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। * * * সর্বশেষে শূদ্র শাসন যুগের আবির্ভাব হবে।' (জাতি-সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র' : স্বামী বিবেকানন্দ; উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, সংকলক-স্বামী আলোকানন্দ; শ্রাবণ, ১৩৯৩ ব. ৬৪ পৃ.)। তাঁর আশা ছিল আরও উচ্চ আরও উন্নত একটি রাষ্ট্র কাঠামো— যেখানে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান' 'ক্ষত্রিয়ের সত্যতা', 'বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি' আর 'শূদ্রের সাম্যাদর্শ'— 'সবগুলিই' 'বজায় থাকবে'; অথচ 'দোষগুলি থাকবে না' 'তাহলে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।' (ওই)

স্বামী বিবেকানন্দের উক্ত প্রস্তাবের তরঙ্গ এখনও ভারতবর্ষকে নতুন জীবন পরিসর রচনা করছে। নতুন ভারতে হিন্দু সমাজকে এই রকম যুক্তি ও মানবিক আদর্শে পুনর্গঠনের চেষ্টা চলছে।

এবার আসি মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তাত্ত্বিক ভাবনায়। বাংলার অন্ত্যজ সমাজের উৎস খুঁজতে তিনি মুসলমান আক্রমণ পূর্ব বাংলার রাজ-শাসিত সমাজ ব্যবস্থার দিকে দৃকপাত করেছেন। ১৯২৯ এর ৯ জুন তারিখে সন্ধ্যা ৬টায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর তত্ত্ব কাঠামোটি নির্দিষ্ট করেছিলেন : 'বাংলাদেশে কীরূপে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে গিলিয়া ফেলিয়াছে সেই কথাটা আজ কিছু বলিব। যখন আফগানরা বাংলা দখল করেন, তখন পূর্বভারতের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ছিল।' ('সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'; প্রথম সংখ্যা, ১৩৩০ ব.)। এই বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধ থাকার প্রস্তাব হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছাড়াও প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু (৬.৭.১৮৭০- ৭.১০.১৯৩৮), দীনেশচন্দ্র সেন (৩.১১.১৮৯৬-২০.১১.১৯৩৯) প্রমুখ পণ্ডিত উত্থাপন করেছেন। সপ্তম শতাব্দীতে হিউ-এন-সাঙ্ যখন কজঙ্গল-গৌড়-কর্ণসুবর্ণ-তাম্রলিপ্ত-সমতট-কামরূপ অঞ্চলে ভ্রমণ করেন, তখন এসব অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ মঠ বিহার চৈত্য দেখেছিলেন। অন্তত পাঁচশো বৌদ্ধ বিহারে গড়ে ৫০ জন ভিক্ষু থাকলে (শিক্ষার্থী- সহ) অন্তত আড়াই হাজার বৌদ্ধ থাকার কথা। তাদের শিষ্য প্রশিষ্য থাকার কথা। বৌদ্ধরা ভিক্ষান্নে জীবন নির্বাহ করতেন। সুতরাং সঙ্ঘ পরিচালিত হতো বিপুল সংখ্যক দেশবাসীর দ্বারা। পাল যুগে অগণ্য বৌদ্ধ দেবদেবী ও বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে— এ থেকে বাংলার বৌদ্ধ যুগের গৌরব সম্বন্ধে জানা যায়।

সেন-সেন বর্মণ রাজত্বের সময় ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন রচিত হতে থাকে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ। হরপ্রসাদের মনে হয়েছে : '১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্যন্ত যাহারা বৌদ্ধ ধর্মের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, ধনের গৌরবে বা অন্য কোনো কারণে বৌদ্ধ ধর্মেই লাগিয়া ছিলেন, নবদ্বীপের ভট্টাচার্য মহাশয়েরা তাঁহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। চৈতন্যদেব তাঁহাদের হিন্দু করিলেও, নিত্যানন্দদেব তাহাদের মন্ত্র দিলেও তাহারা অনাচরণীয় হইয়াই রহিয়াছেন।' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৩৪তম অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা; ১৩৩৬ ব.)

এই প্রস্তাবের ফলে বাংলার মধ্যযুগের সাহিত্যে বৌদ্ধ প্রভাব অনুসন্ধান করেছেন বেশ কিছু গবেষক। চর্যাগীতির সমাজ পরিবেশ ব্যাখ্যা করেছেন। তবে প্রস্তাবটি একটু নড়বড়ে। এ থেকে ভারতের অন্য অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক অস্পৃশ্যের উদ্ভবকে ঠিকঠাক ব্যাখ্যা করা যায় না। সব থেকে বড় কথা, বৌদ্ধ ধর্মদর্শনের সঙ্গে আমাদের দেশে হিন্দু ধর্মেও বহু শাখার দ্বন্দ্ব সংঘাত বিতর্কেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাল রাজাদের বহু ভূমিদানপত্র তাম্রশাসন পাওয়া যায়— হিন্দু মন্দিরের জন্য সেবক প্রদত্ত হয়েছে। পাল রাজারা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। তবে তাঁদের পরিবারে শৈব বৈষ্ণব শাক্ত মতের মানুষ ছিলেন— ব্রাহ্মণ মন্ত্রীও ছিলেন। সেন-সেনবর্মণ যুগেও ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য প্রাসারে বল প্রকাশ করার সংবাদ নেই। এভাবে নিম্ন বর্গের ইতিহাস রচনা বিভ্রান্তিকর।

স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করে এই রচনা শেষ করব। পরে কোনো অবকাশে বাংলা সাহিত্যে নিম্ন বর্গ সম্পর্কে ধারণা-অভিজ্ঞতা আর উপস্থিতির বহুমাত্রিক দিগন্তটি ধরবার চেষ্টা করব। 'পরিব্রাজক'- এর সেই অকৃত্রিম উৎসাহবাক্যগুলি বাংলা ও ভারতবর্ষের শূদ্র-সমাজ সম্পর্কে তাঁর আশা সুস্পষ্ট : 'নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালো মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে।... এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।' ('পরিব্রাজক'; উক্ত; ৬৫ পৃ.)। শতাব্দী পার হয়েছে। এখন ভারতের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য নিশ্চয় প্রস্তুত হয়েছে। ইতিহাস পাশ ফেরে— আমাদের দেশের কালান্তরও উপস্থিত। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সিদ্ধান্ত 'কোনো হিন্দু পতিত হতে পারে না।' না, সগর্বে হিন্দু বলতে পারা নিম্নবর্গের খেটে খাওয়া ঘাম ঝরানো মানুষ আজ হিন্দু সমাজকে ভাঙার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত কেন নেবেন? আজ ভবিষ্যৎ ভারত সগর্বে বলছে আমি হিন্দু।

(লেখক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP
SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN
করুন
উন্নতি করুন
DRS INVESTMENT
Contact :
9830372090
9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
UTI Mutual Fund | HDFC MUTUAL FUND | SBI MUTUAL FUND A partner for life.

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ ও সমাজ-জাগরণ

সুদীপ বসু

উপন্যাস-গল্প-নাটক-কবিতা-প্রবন্ধ— সাহিত্য-সংরূপের এই সবকটির মূল অবলম্বন দেশ ও জাতি। প্রাবন্ধিক, নাট্যকার এবং কবির মতো কথাকারেরাও নির্দিষ্ট কালের মানুষের ছবি আঁকেন তাঁদের রচনায়। সেখানে থাকে সমাজের উচ্চ-মধ্য-নিম্ন শ্রেণীর মানুষের ব্যক্তিচেতনা, সমাজচেতনা ও দেশচেতনার কথা। বলা বাহুল্য সমাজচেতনা সমাজের সব মানুষের একই রকম হয় না। সাধারণ সামাজিক মানুষ ব্যক্তিস্বার্থের কথা প্রথমে ভাবেন। সেটির পুরো বা কিছু পূরণ হবার পরেই সমাজ বা দেশের চিন্তা তাঁদের ভাবায়। অন্যদিকে এমন সামাজিকও আছেন যাঁদের কাছে সমাজ বা দেশই প্রধান— ব্যক্তিস্বার্থের কোনও মূল্য তাঁদের কাছে নেই। এসব মানুষেরা অবশ্যই বিরল গোত্রের। মনে রাখা ভালো যে, সমাজচেতনা বা দেশচেতনায় আকীর্ণ মানুষের মনেই দেশভক্তির সুবিপুল জাগরণ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মধ্যে এই দেশভক্ত মানুষের ছবি আঁকা আছে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবোধ এবং সমাজ-জাগরণ শব্দগুলি একটি দেশের সাহিত্যসৃষ্টির চরিত্রকে প্রকাশ করে।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাহিনিবয়ন, চরিত্রনির্মাণে স্কটিশ ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস (যথা— Ivanhoe, Rob Roy, Waverly, The Bride of Lammermoor, The Lady of the Lake ইত্যাদি) প্রভাববিস্তার করলেও এইসব উপন্যাসের জাতিচরিত্র নির্মাণ করেছে স্বদেশ ও স্বকাল। ফলে জাতীয়তাবাদী-ধারা এদের মূল বৈশিষ্ট্য। লেখকেরা ইতিহাসের আখ্যান অবলম্বন করে দেখাতে চেয়েছেন পরাধীন দেশের সুতীব্র এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতালাভ কীভাবে সম্ভব! ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্তের বিখ্যাত রচনাগুলি ছাড়াও ১৮৭৫ থেকে ১৮৮২/৮৩ পর্যন্ত বেশ কিছু ঐতিহাসিক উপন্যাস পাওয়া যায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচনাকার হলেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থক স্রষ্টা। তাঁর রচনাতে জীবনের সত্য ও ইতিহাসের তথ্যের মধ্যে মেলবন্ধনের সার্থক প্রয়াস চোখে পড়ে। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর উপন্যাসের (*মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত*, *রাজপুত জীবনসন্ধ্যা*) চরিত্রদের ইতিহাসের কঠিন বাস্তব ভূমিতে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর লেখায় যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক চিত্র আছে। ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ উপাদান পেয়েছি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় (*শশাঙ্ক*, *ধর্মপাল*, *ধ্রুবা* প্রভৃতি)। তবে এঁরা প্রত্যেকেই ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন হৃদয়ে লালন করেছেন। তাই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এঁদের রচিত সমস্ত ঐতিহাসিক কাহিনিতেই জাতীয়তাবোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (জন্ম ৩০ মার্চ ১৮৯৯ — প্রয়াণ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭০) ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ধাঁচ কিছু আলাদা। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার কালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত। তাই আপাতভাবে মনে হতেই পারে যে জনমানসে জাতীয়তাবোধ জাগানোর দায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেই। কিন্তু এই ধারণা একান্ত বিভ্রান্তিকর। স্বাধীন মাতৃভূমিতে জাতীয়তাবোধ অধিকতর পরিমাণে জাগ্রত করা দরকার। দেশবাসীর মনে দেশভক্তি উপযুক্ত পরিমাণে না থাকলে ছদ্ম-দেশপ্রেমিকের রক্তাক্ত লোলুপ ছুরিকাঘাতে দেশের স্বাধীনতা অচিরে বিলুপ্ত

> 'প্রাচীন বাংলা দেশ লইয়া গল্প লিখিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে ছিল, কিন্তু বাংলা দেশের বিশিষ্ট আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার মত মালমশলা কোথাও পাই নাই। নীহাররঞ্জনের বইখানি পড়িয়া যে অপূর্ব উপাদান পাইয়াছি তাহাই অবলম্বন করিয়া উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি। শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বাংলা দেশে যে শতাব্দীব্যাপী মাৎস্যন্যায় আরম্ভ হইয়াছিল তাহারই সূচনা আমার গল্পে আছে। বাঙালির জীবনে ইহা এক মহা ক্রান্তিকাল। আধুনিক বাঙালির জন্ম এই সময়।

হবার সম্ভাবনা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই প্রবল দেশভক্তি অনুস্যূত হয়ে আছে। তাই বারংবার ভারতবর্ষ নামক ভূমিখণ্ডের সার্বভৌম চিত্র লেখক দেখাবার চেষ্টা করেছেন। ভারতের নানা প্রান্তের দেশভক্ত নৃপতি এবং জনসাধারণ কীভাবে হৃদয়ের শোণিত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন এবং তার বিপরীতে আছে বিশ্বাসঘাতক মানুষেরা— তার কথা শরদিন্দুর লেখায় পাই। শরদিন্দুর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনি রাজা এবং জনসাধারণের দেশভক্তিকে একইসঙ্গে দেখাতে পেরেছেন। তবে যেহেতু তাঁর রচনার বিষয় উপন্যাস— তাই হৃদয়ের কথালাপও তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে আছে। আসলে শরদিন্দুর ব্যক্তিগত জীবন তাঁকে প্রাদেশিক না করে সর্বভারতীয় কথাশিল্পীতে রূপান্তরিত করেছে। তাঁর জন্ম অবিভক্ত বিহারে, উচ্চ বিদ্যাচর্চা কলকাতায় আর কর্মজীবন মহারাষ্ট্রের তদানীন্তন বোম্বাই ও পুনায়। ফলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে রাজনৈতিক অস্থিরতা, কুটিল মন্ত্রণা, শাণিত অস্ত্রের ঝলসানির মধ্যেও ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্যরূপ—শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্— ফুটে উঠেছে।

২

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাবিত হয়েছিলেন আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্যের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা। তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—

ছেলেবেলায় ইতিহাসের ভাল ছাত্র ছিলাম না, তবে ইতিহাস সম্পর্কে একটা মোহ ছিল। ঐতিহাসিক গল্প লেখার প্রেরণা পাই বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি ভাষার মধ্যেই বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায়— বিশেষ করে ঐতিহাসিক বাতাবরণ। ইতিহাস থেকে চরিত্রগুলো কেবল নিয়েছি; কিন্তু গল্প আমার নিজের। সর্বদা লক্ষ্য রেখেছি কি করে সেই যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায়। যে সময়ের গল্প তখনকার রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পোশাক, অস্ত্র, আহার, বাড়িঘর ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব না জানলে যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায় না। এরপর আছে ভাষা। ঐতিহাসিক গল্পের ভাষাও হবে যুগোপযোগী।[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই শরদিন্দু আমাদের পরিচিত ও প্রচলিত ইতিহাসকে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয় করেননি। তাঁর উপন্যাসের পটভূমি সুদূর অনালোচিত স্বপ্নময় অতীত। বাংলা উপন্যাস রচনায় যখন বাস্তবধর্মী জীবনভাবনার প্রবল প্রয়োগ শুরু হয়েছে, সেই সময়ে তিনি নিজস্ব রীতি ও ঢঙে ঐতিহাসিক কল্পনার সাহায্যে অজানা অতীত যুগের রূপরেখা এঁকেছেন। *কালের মন্দিরা* (১৩৬০ বঙ্গাব্দ), *গৌড়মল্লার* (১৩৬১ বঙ্গাব্দ), *তুমি সন্ধ্যার মেঘ* (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), *তুঙ্গভদ্রার তীরে* (১৩৭২ বঙ্গাব্দ) প্রত্যেকটি রচনাতেই অজানা অতীতকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন এবং তারই মধ্যে জীবনের সত্যকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন (শরদিন্দু রচিত *কুমারসম্ভবের* কবি নামক পঞ্চম উপন্যাসটিকে খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। কারণ এই কাহিনির ভিত্তি মহাকবি কালিদাস সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী ও গল্পগাথা। তাই *কুমারসম্ভবের কবি* উপন্যাসটি আমাদের আলোচনার বাইরে)। এই চারটি উপন্যাস ছাড়াও শরদিন্দু কয়েকটি কিশোর উপন্যাসে মহারাষ্ট্রের পটভূমিকায় শিবাজি কর্তৃক স্বাধীন মারাঠা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। একটি মারাঠি বালক সদাশিব সেইসব উপন্যাসের নায়ক। তবে এখানে ইতিহাসের স্থান সামান্য হওয়ায় এই কিশোর উপন্যাসগুলিও আমাদের আলোচনায় আসেনি।

কালের মন্দিরা

ভারতবর্ষ অধিকারে হূণজাতির চেষ্টার প্রেক্ষিতে রচিত উপন্যাস *কালের মন্দিরা*। গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে (৪৫৫-৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ) মধ্যএশিয়া থেকে দুর্ধর্ষ হূণজাতির একটি শাখা হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে গান্ধারের মধ্যে দিয়ে বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। পরে স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধে নিদারুণভাবে তারা পরাস্ত হয়। স্কন্দগুপ্তের এই বীরত্বের উল্লেখ করে *কালের মন্দিরা* উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, **আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কেবল স্কন্দগুপ্ত চরিত্র ঐতিহাসিক।**[২] উপন্যাসের কাহিনির গতি সরলরৈখিক। দ্বাদশ সহস্র যাযাবর হূণ যেদিন বিটঙ্ক রাজ্য অধিকার করে পঞ্চনদের শ্যামল উপত্যকায় স্থায়ী বসবাস শুরু করেছিল, সেই ঘটনার পঁচিশ বছর পরে কাহিনির সূত্রপাত। যে আর্য রাজা তখন বিটঙ্ক রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী তিলক বর্মা সেদিন শিশুমাত্র। নিষ্ঠুর হূণ আক্রমণের মধ্যে একটি দয়ালু হূণই তার প্রাণরক্ষা করে। রক্তাক্ত সেই শিশু যুবাবয়সে যুদ্ধব্যবসায়ী সামান্য সৈনিক, তিলক বর্মা নামের পরিবর্তে চিত্রক বর্মা নামে পরিচিত এবং বংশগৌরব ও পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পরে ঘটনাচক্রে তিনি বিটঙ্করাজ্যে আসেন এবং তাঁর সত্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়। কাহিনির এই পর্যায়ে গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্তের রঙ্গস্থলে প্রবেশ যিনি ভারতবর্ষ থেকে হূণজাতিকে বহিষ্কার করতে বদ্ধপরিকর। হূণরাজ্য বিটঙ্কের কাছ থেকে অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের জন্যে তিনি দূত পাঠান। এদিকে বিটঙ্করাজ্যের অধীনস্থ চষ্টন দুর্গের অধিপতি কিরাত, রাজা রোট্টকে তার দুর্গে বন্দি করে রোট্টকন্যা যশোধরাকে বিবাহে ইচ্ছুক। এই পরিস্থিতিতে সম্রাট স্কন্দগুপ্তের সাহায্য গ্রহণ করেন যশোধরা। এই সময়েই যশোধরার সঙ্গে তিলক বর্মার প্রণয়সম্পর্ক তৈরি হয়। কাহিনির পরিণতিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিলক বর্মার তরবারিতে কিরাতের মৃত্যু এবং যশোধরা ও তিলক বর্মার বিবাহ ঘটে।

ভারতবর্ষের অখণ্ডতা কোন্ পথে রক্ষিত হতে পারে, এই কাহিনির মধ্যে তার অন্তত তিনটি ইঙ্গিত আছে : প্রথমত, সম্রাট স্কন্দগুপ্তকে এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন, বিরাট গুপ্তসাম্রাজ্যের সম্রাট কীভাবে ক্ষুদ্র বিটঙ্ক রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন। এমনকী রোট্ট ধর্মাদিত্যের কন্যা রট্টা যশোধরাকে বিবাহে স্কন্দগুপ্ত আগ্রহী ছিলেন। অর্থাৎ বৃহতের সঙ্গে ক্ষুদ্রের মিলন এই উপন্যাসে ফুটেছে।

দ্বিতীয়ত, যে হিংস্র হূণেরা নগ্ন তরবারি

হাতে ভারতবর্ষে (এক্ষেত্রে বিটঙ্ক রাজ্যে) প্রবেশ করে রক্তস্নান করে রাজ্য অধিকার করেছিল, তাদেরই নেতা রোট্ট কালগতে হূণীয় বর্বরতা ত্যাগ করে অহিংসা-ত্যাগ-তিতিক্ষাপূর্ণ বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করে ধর্মাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ হূণের আর্যীকরণ ঘটেছে।

তৃতীয়ত, রোট্ট ধর্মাদিত্যের কন্যা রট্টা যশোধরার সঙ্গে বিটঙ্ক রাজ্যের ভূতপূর্ব আর্য রাজার পুত্র চিত্রক বা তিলক বর্মার বিবাহে আর্য এবং হূণ রক্তের মিলন হয়েছে। কাহিনির শেষ পর্যায়ে এটাও দেখা গেছে যে রট্টা যশোধরা হূণকন্যা হয়েও তাঁর স্বামী তিলক বর্মাকে ভারতবর্ষ আক্রমণকারী বহিঃশত্রু হূণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্ররোচিত করেছেন। তিলক বর্মার উদ্দেশে রট্টা যশোধরার সেই সংলাপ উদ্ধৃতিযোগ্য :

"তুমি ভাবিতেছ, হূণ আমার স্বজাতি, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে আমি দুঃখ পাইব।... না। **হূণ যেমন তোমার শত্রু, তেমনই আমার শত্রু। আমার দেশ যে আক্রমণ করে, পরমাত্মীয় হইলেও সে আমার শত্রু।**"[৩] এই দৃষ্টিভঙ্গি ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল বলেই *কালের মন্দিরা* উপন্যাসের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতা উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন :

যাহারা মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি চিরস্থায়ী করিতে চাহে তাহারা ইতিহাসের অমোঘ ধর্ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে, তাহারা শুধু বিচারমূঢ় নয়—মিথ্যাচারী।[৪]

৩

গৌড়মল্লার

গৌড়মল্লার উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, "শ্রীনীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের বিরাট গ্রন্থ বাঙালির ইতিহাসে সংগৃহীত উপাদান আমার কাহিনীর ভিত্তি। শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি নামক পুস্তিকা হইতে সাহায্য পাইয়াছি।" আরও বলেছেন—

গৌড়রাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়বঙ্গে শতবর্ষ ধরিয়া মাৎস্যন্যায় চলিয়াছিল, চারিদিক হইতে রাজ্যগৃধ্নু রাজারা আসিয়া দেশকে ছিন্নভিন্ন করিয়া

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

'ভারতবর্ষের শতাধিক রাজা নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করিতে ব্যস্ত। যে-সব রাজারা যুদ্ধ করিতে ভালবাসে তাহারাও বহিরাগত আততায়ীর কথা ভাবে না, নিজের প্রতিবেশী রাজার গলা কাটিতে পারিলেই সন্তুষ্ট।'

দিয়াছিলেন। একদিক হইতে আসিয়াছিলেন জয়নাগ ভাস্করবর্মা, অন্যদিক হইতে হর্ষবর্ধন। তারপর আরও অনেকে আসিয়াছিলেন, বাংলা দেশ লইয়া কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। শেষে শতবর্ষ পরে পাল বংশের গোপাল আসিয়া শান্তি শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।[৫]

শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রসন্ন না থাকলেও তাঁর সময় বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম পাশাপাশি মোটমুটি শান্তিতেই বিরাজ করেছিল। এই উপন্যাসের কাহিনি শশাঙ্কের মৃত্যুর অল্প পরে আরম্ভ হয়ে তার বিশ বৎসর পরে শেষ হয়েছে। সেই সময়ের বাঙালির সাংস্কৃতিক-চরিত্র এবং নগর ও গ্রাম জীবনের প্রতিচ্ছবি এই উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটি সম্পর্কে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য—

প্রাচীন বাংলা দেশ লইয়া গল্প লিখিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে ছিল, কিন্তু বাংলা দেশের বিশিষ্ট আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার মত মালমশলা কোথাও পাই নাই। নীহাররঞ্জনের বইখানি পড়িয়া যে অপূর্ব উপাদান পাইয়াছি তাহাই অবলম্বন করিয়া উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি। শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বাংলা দেশে যে শতাব্দীব্যাপী মাৎস্যন্যায় আরম্ভ হইয়াছিল তাহারই সূচনা আমার গল্পে আছে। বাঙালির জীবনে ইহা এক মহা ক্রান্তিকাল। আধুনিক বাঙালির জন্ম এই সময়।[৬]

উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে লেখক আসলে সামগ্রিকভাবে একটি জাতির অবক্ষয়ের চিত্র এঁকেছেন। একদিকে যেমন কাহিনির টানটান উত্তেজনা, অন্যদিকে সমাজজীবনের গহনে প্রবেশ করে লেখক যুগমানসকেও নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন নিষ্ঠাবান ইতিহাসবিদের মতো।

গৌড়রাজ শশাঙ্ক যখন হর্ষবর্ধনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন সৈন্য সংগ্রহের জন্য রাজপুরুষ কপিলদেব বেতস গ্রামে আসেন এবং গ্রাম্যবধূ সুন্দরী গোপার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর ঔরসে নিঃসন্তান গোপার এক পরমাসুন্দরী কন্যার জন্ম হয়। নাম রঙ্গনা। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মানবদেব গৌড়ের রাজা হন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে আহত অবস্থায় তিনিও বেতস গ্রামে আসেন। সেখানেই দেখা হয় রঙ্গনার সঙ্গে। গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন রঙ্গনাকে। রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ফিরে যাওয়ার সময় অভিজ্ঞানস্বরূপ হাতের সোনার অঙ্গদ দিয়ে যান রঙ্গনাকে। উপন্যাসের নায়ক বজ্রদেব মানবদেব-রঙ্গনার সন্তান এবং শশাঙ্কের পৌত্র। যৌবনে পিতৃপরিচয় জানার পর বজ্রদেব রাজধানী অভিমুখে যান পিতৃ-সন্ধানে। রাজধানীর পথে ইতিহাসখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত শীলভদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁর কাছ থেকেই বাংলাদেশের সংকটজনক অবস্থার কথা জানতে পারেন বজ্রদেব। জানতে পারেন পিতার করুণ পরিণতির কথা (তবে সেই তথ্য যে ঠিক নয় বজ্রদেব তা পরে স্বয়ং মানবদেবের মুখে শুনেছিলেন)। শীলভদ্রের পরামর্শমতো

শশাঙ্কের সচিব কোদণ্ড মিশ্রের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। কাহিনি এরপর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে দ্রুত গতিতে এগিয়েছে। প্রায় রূপকথার ঢঙে ছদ্মবেশে বজ্রদেবের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে গমন, রঙ্গিনী নায়িকা কুহু এবং কামার্তা রানি শিখরিণীর সঙ্গে পরিচয়, গৌড়ের তদানীন্তন রাজা অগ্নিবর্মার মৃত্যু, একদিনের জন্য শশাঙ্কের উত্তরাধিকারী হিসেবে গৌড়ের সিংহাসনে বজ্রের আরোহণ এবং অনতিবিলম্বে চতুর নাগরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়। অবশেষে বজ্রদেব গ্রামে ফিরে আসেন, সেখানে পিতা মানবদেব ও প্রিয়জনদের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়।

শশাঙ্ক, ভাস্করবর্মা, শীলভদ্র, গৌড় প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাম ও স্থান এবং অনুষঙ্গ লেখক ব্যবহার করেছেন ঠিকই, কিন্তু কাহিনিতে মানবদেব ও বজ্রদেবের যে ঘটনা রয়েছে সে সম্পর্কে ইতিহাসে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। বস্তুত এই কাহিনি রচনার উদ্দেশ্য ‘বাঙালির চরিত্র, সংস্কৃতি, গ্রাম্য জীবন, নাগরিক জীবনের’[৭] চিত্রাঙ্কন। রাজ্যরাজনীতির রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এই কাহিনিতে থাকলেও বাঙালি বা ভারতবাসীর মূল শিকড় যে গ্রাম ভারতে প্রোথিত— সেকথা এই উপন্যাসপাঠে স্পষ্ট বোঝা যায়। গ্রামীণজীবন থেকে সরে গিয়ে ভারতবাসী যেদিন নাগরিকজীবনের মধুপানে মত্ত হয়েছে, সেদিন থেকেই সে ছিন্নমূল জাতিতে পরিণত। এর বিপরীত প্রেক্ষায় আছেন মহারাজ শশাঙ্কদেবের পৌত্র বজ্রদেব যিনি গ্রামীণ পরিবেশে জাত এবং গ্রাম্যবালিকা গুঞ্জার প্রেমে মগ্ন। আর কাহিনির শেষে শশাঙ্কদেবের পুত্র মানবদেব বলেছেন :

আমার পুত্র গৌড়ের সিংহাসনে বসেছে— হোক একদিনের জন্য— আমার আর দুঃখ নেই। কিন্তু আচার্য শীলভদ্র যথার্থ বলেছেন, আজ থেকে ও-কথা ভুলে যেতে হবে। আমরা গৌড়দেশের সামান্য গ্রামবাসী, এই আমাদের পরিচয়। আমাদের রক্ত জনসাধারণের রক্তের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে, এই আমাদের গৌরব। রাজৈশ্বর্য চিরন্তন নয়, মনুষ্যত্ব চিরন্তন। আমাদের নাম লোকে ভুলে যাক ক্ষতি নেই, আমাদের মনুষ্যত্ব যেন যুগ- যুগান্তর ধরে গৌড়বঙ্গের অন্তরে বেঁচে থাকে।[৮]

তাই সৈন্যদের দ্বারা ধ্বস্ত গ্রামের অধিবাসীরা আবার নতুন করে ঘর বাঁধে, ফসল ফলায়। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাজকীয় পরিমণ্ডলের বাইরে যে জীবন তার মধ্যেই অনুভূত হয় দেশের হৃৎস্পন্দন— আমার ভারত অমর ভারত।

৪

তুমি সন্ধ্যার মেঘ

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শরদিন্দুর অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের থেকে ভিন্ন গোত্রের। উপন্যাসের সূচনাতেই দশম শতাব্দীর ভারত- ইতিহাসের বর্ণনা লেখক করেছেন যেখানে হূণপরবর্তী তুর্কি মুসলমান আক্রমণে দিশাহারা পশ্চিম ভারতের কথা আছে। তিনি বলেছেন, এইকালে পূর্বভারতের রাজন্যবর্গ আদৌ অবহিত ছিলেন না যে, পূর্বভারতও অল্প পরেই মুসলমানদের পদানত হবে। কেবল মহাজ্ঞানী বৌদ্ধভিক্ষু শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর উদ্বিগ্নচিত্তে এই রাজনৈতিক দুর্যোগ নিরীক্ষণ করেছেন। শরদিন্দুর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, ‘‘যে লঘুচিত্ততা অপরিণামদর্শিতা স্বজাতিদ্রোহিতা ও অন্তঃকলহের ফলে ভারতের সংস্কৃতি নয়শত বৎসরের জন্য অস্তমিত হইয়াছিল তাহারই চিত্র আমার কাহিনির পটভূমিকা।’’[৯]

মগধ রাজপরিবারের সঙ্গে চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের বিরোধ-বিদ্বেষ, পরাজিত লক্ষ্মীকর্ণের মগধরাজ নয়পালকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, বিগ্রহপালকে অপদস্থ করার প্রচেষ্টা, শেষ পর্যন্ত সেই চেষ্টা বিফল হওয়া এবং উত্তেজিত লক্ষ্মীকর্ণের মগধকে আক্রমণের প্রয়াস প্রভৃতি নানা ঘটনা *তুমি সন্ধ্যার মেঘ*-এর বিষয়। উপন্যাসের শেষে লক্ষ্মীকর্ণের যুদ্ধ পরিত্যাগ করে কন্যা-জামাতাকে কাঁধে তুলে নৃত্যের মধ্যে দিয়ে কাহিনি মিলনান্তিক আখ্যানের রূপ পেয়েছে।

এই উপন্যাসে ইতিহাস কী পরিমাণ গৃহীত তার উল্লেখ উপন্যাসের ভূমিকায় আছে, ‘‘দীপঙ্কর, রত্নাকর, শান্তি, নয়পাল, বিগ্রহপাল, লক্ষ্মীকর্ণদেব, বীরশ্রী, যৌবনশ্রী, জাতবর্মা, বজ্রবর্মা, যোগদেব ও তিব্বতীয় আচার্য বিনয়ধরের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। দীপঙ্করের শান্তি-প্রচেষ্টা এবং বিগ্রহপালের সহিত যৌবশ্রীর বিবাহও ঐতিহাসিক ঘটনা।’’[১০] শরদিন্দুর লেখা থেকে আগেই জেনেছি সার্বভৌম নরপতির অভাবে পূর্বভারত জুড়ে রাজন্যবর্গের পারস্পরিক যুদ্ধ এই অঞ্চলে মুসলমানশক্তির আগমনের পথ প্রশস্ত করেছিল। এই আসন্ন বিপর্যয়ের চিত্র পূর্বভারতের একটি মানুষের চিত্তকে কম্পিত করেছে— তিনি শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর। বস্তুত শ্রীজ্ঞান অতীশ যেন এই উপন্যাসের দ্রষ্টা পুরুষের ভূমিকায় আবির্ভূত। উপন্যাসের সূচনাংশে তাঁর স্বগতকথন সুগভীর দুঃখমথিত যেখানে দেশের প্রতি উজাড় করা ভালবাসা আছে—

ভারতবর্ষের শতাধিক রাজা নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করিতে ব্যস্ত। যে-সব রাজারা যুদ্ধ করিতে ভালবাসে তাহারাও বহিরাগত আততায়ীর কথা ভাবে না, নিজের প্রতিবেশী রাজার গলা কাটিতে পারিলেই সন্তুষ্ট।... তুরস্কগণ নিষ্ঠুর যোদ্ধা, তাহার উপর ঘোর বিশ্বাসঘাতক। তাহাদের ধর্মজ্ঞান নাই; যুদ্ধে তাহাদের কে পরাস্ত করিবে? সমস্ত আর্য রাজারা একত্র হইলে পরাস্ত করিতে পারে। কিন্তু আর্য রাজারা কখনও একত্র হইবে না, তাহারা একে একে মরিবে, তবু একত্র হইবে না।[১১]

আশ্চর্য এই, যে-শ্রীজ্ঞান অতীশ স্বয়ং বৌদ্ধ এবং অহিংসা পরমো ধর্মে বিশ্বাসী, তিনি পর্যন্ত বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার কথা ভেবেছেন! এমনকী বিবদমান দুই রাজশক্তি চেদীরাজ ও পালরাজকে একত্র বসিয়ে শান্তিস্থাপনের চেষ্টাও তাঁর মধ্যে দেখা গেছে যা কোনও অধ্যাত্মপথিকের অভ্যস্তপথে বিচরণ নয়। তাঁর প্রাসঙ্গিক আত্মকথন পুনশ্চ উদ্ধার করছি যা আক্ষরিক অর্থে আমাদের বিস্ময়ের কারণ :

হিংসায় হিংসার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়... সত্য কথা... কিন্তু হিংসা ও আপৎ নিবারণ এক বস্তু নয়, রাগদ্বেষ অনুভব না করিয়া বিগতজ্বর হইয়া যুদ্ধ করা যায়।[১২]

এখানেই শেষ নয়— কেন শ্রীজ্ঞান অতীশ তিব্বতে যাত্রা করেছিলেন তারও

যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন লেখক। শত্রুবিতাড়নে তিব্বতিরাজের প্রেরিত অগ্নিকন্দুকের (আধুনিক 'বোমা'?) বিপুল ক্ষমতা দেখে, ভারতবর্ষের বহিঃশত্রু প্রতিরোধের জন্য অগ্নিকন্দুক প্রস্তুতির গুপ্তবিদ্যা অধিগত করতে অতিশয় আগ্রহী শ্রীজ্ঞান অতীশ স্বয়ং তিব্বতে পৌঁছেছিলেন। এই সূত্রে তিব্বতি বৌদ্ধ আচার্য বিনয়ধরের উদ্দেশে শ্রীজ্ঞান অতীশকে দিয়ে লেখক উচ্চারণ করিয়েছেন :

আচার্য বিনয়ধর, আপনি জানেন ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে এক মহা আপৎ উপস্থিত হয়েছে। সংক্রামক ব্যাধির মত এ আপৎ ক্রমে পূর্বদিকে এগিয়ে আসছে। একে যদি সময়ে শাসন না করা যায় তাহলে ভারতের সংস্কৃতি ঐতিহ্য কিছু থাকবে না, সঙ্ঘ এবং ধর্ম ভারত থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে, এই বিক্রমশীল বিহার ভগ্নস্তূপে পরিণত হবে।... আমাকে তিব্বতে যেতেই হবে। এ বিদ্যা না শিখতে পারলে ভারতের রক্ষা নেই।[১৩]

একজন সহায়সম্বলহীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র তৈরির জন্যে অতিশয় আগ্রহী— ভারত-ইতিহাসে এ ঘটনা বোধহয় ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। তাহলে রাজশক্তির উপর সমস্ত আশাভরসা হারিয়ে (রাজন্যবর্গের ওপর শ্রীজ্ঞান অতীশের কোনও আস্থা যে ছিল না তা একটু আগেই তাঁর আত্মকথনে আমরা দেখেছি) ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এবং ঐক্য রক্ষায় সার্বিক সশস্ত্র প্রজাবিপ্লব সংগঠিত করার কথাই কি ভেবেছিলেন শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর? নির্দ্বিধায় বলা যায়, অহিংসা যাঁর জীবনসত্য, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষায় তাঁর মননে উদ্ভূত প্রতিরোধের রাজনীতির কথা এই উপন্যাসের মূল সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলা বাহুল্য শ্রীজ্ঞান অতীশের দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে গেছে। আর সমস্ত উপস্যাসের পৃষ্ঠা থেকে পৃষ্ঠান্তর ভরে আছে মদগর্বী রাজন্যবর্গের বৃথা শোণিতক্ষয়ে। পরিণতিতে ভারত ইতিহাসে নেমেছে দীর্ঘ 'মহারাত্রির অন্ধকার'।[১৪]

কেবল শ্রীজ্ঞান অতীশ নয়, উপন্যাসের আদিঅন্ত জুড়ে লেখকের দীর্ঘশ্বাসও পাঠক অনুভব করে।

৫
তুঙ্গভদ্রার তীরে

ইতিহাসের কাঠামোকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বৈব অনুসরণ করেছেন ***তুঙ্গভদ্রার তীরে*** উপন্যাসে। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখকের স্বীকারোক্তি, 'আমার কাহিনী Fictionised history নয়, Historical fiction.' আরও বলেছেন যে, 'আমার কাহিনীতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকিলেও কাহিনি মৌলিক; ঘটনাকাল খ্রিস্টাব্দ ১৪৩০-এর আশে পাশে। তখনো বিজয়নগর রাজ্যের অবসান হইতে শতবর্ষ বাকি ছিল।'[১৫] তিনি জানিয়েছেন Robert Sewell-এর A forgotten Empire, রমেশচন্দ্র মজুমদারের The Delhi Sultanate গ্রন্থদুটি থেকে গৃহীত ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে বিজয়নগরের 'গৌরবময় স্মৃতি' তুঙ্গভদ্রার তীরে উপন্যাস।[১৬] ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার অলৌকিক মিলন ঘটিয়ে এই উপন্যাসটি শরদিন্দুর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাসের শিরোপার অধিকারী।[১৭] *গৌড় মল্লার* উপন্যাসে রাজবংশীয়রা বংশগৌরব ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। আর *তুঙ্গভদ্রার তীরে*-তে সাধারণ মানুষ এসে হাত ধরলেন রাজার। এমন অপূর্ব কৌশলে এই ঘটনা সম্ভব হয়েছে যে পাঠকের যুক্তিবোধ কোথাও আহত হয় না। এহ বাহ্য। বিজয়নগরের গৌরব অস্তমিত হবার কয়েক শতাব্দী পরে ইংরেজ রাজত্বে যে-নারী স্বাধীনতার সূত্রপাত, তার আভাসও এই কাহিনিতে আছে। কলিঙ্গ রাজকন্যা কুমারী ভট্টারিকা বিদ্যুন্মালার পতিনির্বাচনের স্বাধীনতার মধ্যে নতুন সমাজ নির্মাণের ছায়াপাত দেখা যায়। রাজকন্যা বরমাল্য দিলেন একজন সাধারণ সামাজিকের কণ্ঠে— সেদিনের প্রেক্ষিতে এও এক সমাজ-জাগরণ।

শক্তিশালী মুসলমান আগ্রাসনে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ চেহারা ইতিপূর্বে শরদিন্দুর রচিত *কালের মন্দিরা*, *তুমি সন্ধ্যার মেঘ* উপন্যাসে পেয়েছি। *তুঙ্গভদ্রার তীরে* উপন্যাসের বিষয় তার থেকে আলাদা। বর্তমান উপন্যাসের পটভূমিকা— দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সঙ্গমবংশীয় রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকাল। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা বিস্তারের জন্যে এবং মুসলমানশক্তিকে প্রতিহত করার জন্যে তিনি নিকট বা দূরবর্তী রাজাদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। অবশেষে কলিঙ্গরাজ গজপতি চতুর্থ ভানুদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাঁর কন্যা বিদ্যুন্মালাকে তিনি বিবাহ করবেন--- এই শর্তানুসারে বিদ্যুন্মালা জলপথে কলিঙ্গ থেকে বিজয়নগরে চলেছেন তাঁর ভাবী স্বামী দ্বিতীয় দেবরায়ের কাছে, সঙ্গে তাঁর বৈমাত্রেয় ভগিনী মণিকঙ্কণা। বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে বিজয়নগরেই। পথিমধ্যে যাদববংশীয় ক্ষত্রিয় যুবক অর্জুনবর্মাকে জল থেকে উদ্ধার, ক্রমে অর্জুনের প্রতি বিদ্যুন্মালার আকৃষ্ট হওয়া, বিদ্যুন্মালার প্রতি দেবরায়-ভ্রাতা কম্পনদেবের মনে কামবাসনার উদ্রেক, রাজাকে কম্পনদেবের হত্যার চেষ্টা এবং অর্জুন কর্তৃক রাজাকে রক্ষা, অর্জুন-বিদ্যুন্মালার প্রেমসম্পর্ক প্রকাশ, অর্জুনকে রাজআদেশে বিজয়নগর থেকে বহিষ্কার, বহিষ্কৃত অর্জুনের বিজয়নগরে ফিরে এসে চূড়ান্ত দেশভক্তির পরিচয়দান, শেষত অর্জুনের সঙ্গে বিদ্যুন্মালার এবং মহারাজ দেবরায়ের সঙ্গে মণিকঙ্কণার বিবাহ--- কাহিনি এটাই।

উপন্যাসের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এবং সমাজ-জাগরণের চিত্র কীভাবে লেখক উপস্থিত করেছেন সে বিষয়ে দু' একটি কথা আগে বলেছি। পুনশ্চ তা পুরোপুরি উপস্থাপনের চেষ্টা করছি।

প্রথমত, রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির মিলনের চিহ্নস্বরূপ রাজকন্যা বিদ্যুন্মালার সঙ্গে সাধারণ নাগরিক এবং যাদববংশীয় ক্ষত্রিয় অর্জুনবর্মার বিবাহ দিয়েছেন শরদিন্দু। ব্যাপারটি অবশ্যই প্রতীকী।

দ্বিতীয়ত, পঞ্চদশ শতকে স্বাধীনচেতা নারীর দৃপ্ত ভূমিকায় উপন্যাসে আবির্ভূত রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা যৌনসঙ্গী নির্বাচনের অধিকার দাবি করেছেন। সপত্নীবেষ্টিত রাজার পরিবর্তে একজন সাধারণ মানুষই

তাঁর কাছে স্বামী হিসেবে অনেক বেশি কাম্য। মণিকঙ্কণাকে লক্ষ্য করে তাঁর উক্তি :

স্ত্রী যদি স্বামীকে পুরোপুরি না পায়, তাহলে বিয়ের কোনো মানেই হয় না।... প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নিরপরাধ মানুষ যেমন বধ্যভূমিতে যায়, আমিও তেমনি (বিজয়নগরে বিবাহ করতে) যাচ্ছি। যে-স্বামীর তিনটে বৌ আছে তাকে কোনোদিন ভালবাসতে পারব না।[১৮]

ঘটনাচক্রে বিদ্যুন্মালার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। যাঁকে তিনি পেয়েছেন সেই অর্জুনবর্মা সাধারণ মানুষ, কিন্তু পত্নীর প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ।

তৃতীয়ত, রাজপরিবারে গুপ্তশত্রুতা কীভাবে রাজবংশে, বৃহৎ অর্থে সমগ্র রাজ্য রাজনীতিতে চরম বিপদ ডেকে আনতে পারে তার উদাহরণ এই উপন্যাসে আছে। মহারাজ দেবরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার কম্পনদেবের রাজসিংহাসনে আরোহণের লোভী কুটিল উচ্চাশা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবরায়ের বাগ্‌দত্তা পত্নীর প্রতি কামময় দৃষ্টিনিক্ষেপ ফল দাঁড়িয়েছে এই— জ্যেষ্ঠ দেবরায়কে কনিষ্ঠ কম্পনদেবের নির্মম ছুরিকাঘাত। ভারতবর্ষের অখণ্ডতা বারেবারে এইভাবেই যে অন্তর্কলহে বিনষ্ট হয়েছে তার নিদর্শন এটি।

চতুর্থত, ভারতবর্ষ নামক মহাদেশের নির্দিষ্ট প্রদেশ কোনও মানুষের মাতৃভূমি নয়। সমগ্র দেশই যে-কোনও ভারতবাসীর মাতৃভূমি। তাই মুসলমান আক্রমণে গুলবর্গা থেকে প্রাণভয়ে পলায়িত অর্জুন বর্মার স্বদেশ এখন বিজয়নগর। লেখকের ন্যারেশনে তার উল্লেখ আছে :

অর্জুন জানিত না যে, মাতৃভূমি বলিয়া কোনো বিশেষ ভূখণ্ড নাই। মানুষের সহজাত সংস্কৃতির কেন্দ্র যেখানে, মাতৃভূমিও সেইখানে।[১৯]

বাংলা উপন্যাস যখন নানা টানাপোড়েন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে এবং জোর দিচ্ছে মনস্বিতার দিকে, তখন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের চিরাচরিত গল্প বলা ও গল্প শোনার পথেই এগোলেন। অতীতের কাহিনিকে শিল্পসুষমা মণ্ডিত করে আবেগময় মুগ্ধতা তৈরি করলেন। ঐতিহাসিক কল্পনার সার্থক প্রয়োগে আঁকলেন অতীত জীবনের বিশ্বস্ত রূপ। অচেনা রহস্যময় ভঙ্গিতে পরিবেশন করলেন আমাদের অতীত গৌরবকে। এখানেই শরদিন্দুর নিজস্বতা এবং বিশিষ্টতাও। শুধু দুঃখ এবং আক্ষেপ এটাই যে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার উপযুক্ত অনুবাদ আজও হয়নি। কেবল সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর লেখক হিসেবে সারা ভারতে তাঁর পরিচিতি রয়ে গেছে। অথচ পশ্চিম ভারত, দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতের প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস তাঁর সর্বভারতীয় লেখকসত্তাকে প্রকাশ করে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কোনওভাবেই প্রাদেশিক লেখক ছিলেন না। তাই আশা করব ভাবীকালে শরদিন্দু-রচনাসমগ্রের হিন্দি এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় উপযুক্ত অনুবাদ হবে।

তথ্যসূত্র :

১। *জীবন কথা, শরদিন্দু অমনিবাস,* শোভন বসু অনুলিখিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টবিংশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৪, পৃষ্ঠা ৬৩৭। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকন্তু জানিয়েছেন যে, ইতিহাসভিত্তিক গল্প লিখে তাঁর অধিক তৃপ্তিলাভ হয়েছে : 'ইতিহাসের গল্প লিখেই বেশি তৃপ্তি পেয়েছি। মনে কেমন একটা সেন্স অব ফুলফিলমেন্ট হয়। গৌড়মল্লার ও তুঙ্গভদ্রার তীরে লেখার পর খুব তৃপ্তি পেয়েছিলাম।' (ঐ, পৃষ্ঠা, ৬৩৭)।

২। *ভূমিকা, কালের মন্দিরা, শরদিন্দু অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১। *কালের মন্দিরা* উপন্যাসে অবলম্বিত কাহিনি যে বহুলাংশে ঐতিহাসিক, তা প্রমাণ করার জন্যে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাঙ্গালার ইতিহাস* গ্রন্থের প্রথম ভাগ (দ্বিতীয় সংস্করণ) থেকে ঐতিহাসিক তথ্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের *ভূমিকায়* উদ্ধার করেছেন :

"মহারাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্কন্দগুপ্ত হিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্ত যৌবরাজ্যে পুষ্য মিত্রীয় ও হূণগণকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্ত পিতৃকুলের বিচালিতা রাজলক্ষ্মী স্থির করিবার জন্য রাত্রি ত্রয় ভূমিশয্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রথমবার পরাজিত হইয়া হূণগণ উত্তরাপথ আক্রমণ বিরত হন নাই, প্রাচীন কপিশা ও গান্ধার অধিকার করিয়া হূণগণ একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।... ৪৬৫ খ্রিস্টাব্দের পর হূণগণ পুনরায় ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করে ও বারবার গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে।" ('ভূমিকা', *কালের মন্দিরা, শরদিন্দু অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১)।

৩। *কালের মন্দিরা, শরদিন্দু অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৫।

৪। *ভূমিকা, কালের মন্দিরা, শরদিন্দু অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১।

৫। *পটভূমিকা, গৌড়মল্লার, শরদিন্দু অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৯।

৬। *গ্রন্থ-পরিচয়* (উদ্ধৃতাংশের নীচে লিখিত আছে 'ডায়েরি, ২৭ জুলাই ১৯৫০'), *গৌড়মল্লার, শরদিন্দু অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬১৩।

৭। *পটভূমিকা, গৌড়মল্লার, শরদিন্দু অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন,

কলকাতা-৭০০ ০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩০।

৮। *গৌড়মল্লার, শরদিন্দু অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৩।

৯। *ভূমিকা, তুমি সন্ধ্যার মেঘ, শরদিন্দু অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৭। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি থেকে জানা যায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের সঙ্গে পরিচয় হবার পরেই হরেকৃষ্ণ তাঁকে চেদীরাজ কর্ণদেব ও বাংলার পাল সম্রাটদের নিয়ে উপন্যাস লিখতে অনুরোধ করেন এবং এই সংক্রান্ত নানা ঐতিহাসিক তথ্য ও আকর গ্রন্থের সন্ধান দিয়ে তাঁকে চিঠিতে লেখেন—

''বাঙ্গালার তথা ভারতের ইতিহাস আমার অন্যতম প্রিয় বস্তু। তুমি যেমন সেই ইতিহাসের উপকরণ লইয়া গল্প-উপন্যাস লেখ, অতীতের সুন্দর বাতাবরণ সৃষ্টি কর। সেকালের সম্রাট, সেনাপতি, সামন্ত, প্রজা— সেই নাম-ধাম। সেকালের উপযোগী কথোপকথন— সে এক অভিনব কল্পলোক। আমি সব চোখের সম্মুখে দেখি— একেবারে সেকালে গিয়া উপস্থিত হই। দুর্গেশনন্দিনীতে, রাজসিংহেও ইতিহাসের ছায়া আছে। কিন্তু কালের মন্দিরা ও গৌড়মল্লারের সঙ্গে তাহার পার্থক্য কত।

''তুমি চেদীরাজ কর্ণদেব আর বাঙ্গালার পাল সম্রাটদের লইয়া একখানি উপন্যাস লেখ। কর্ণদেব আপন কন্যা যৌবনশ্রীকে বিগ্রহপালের হাতে দিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার সে এক গৌরবময় অধ্যায়। রাঢ়ের তখন বিপুল ঐশ্বর্য।'' (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের চিঠি, ১৮ শ্রাবণ ১৩৬১)।

অপর একটি চিঠিতে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন পুনশ্চ লিখেছেন—

''...১ম মহীপালের পুত্র নয়পাল। তার পুত্র ৩য় বিগ্রহপাল। জয়পাল না, নয়পালই প্রকৃত নাম। ইহাদের রাজধানী ছিল গৌড়ে এবং মগধে। মালদহ এবং পাটনায়।... নয়পাল এবং বিগ্রহপালের সঙ্গে চেদীরাজ কর্ণদেবের যুদ্ধ মগধে আরম্ভ হইয়া রাঢ় পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রাঢ় দেশের পাইকোড় (প্রাচীকোট) গ্রামে চেদীকর্ণের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ণদেবের রাজধানী ছিল জব্বলপুরে নর্মদা তীরে ত্রিপুরী। মর্মর পাহাড়ের সৌন্দর্য লালিতা কর্ণদেবের দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠা বীরশ্রী, বঙ্গেশ্বর জাতবর্মা ইহাকে বিবাহ করেন। বঙ্গ বা সমতট ইহাদের রাজধানী। দ্বিতীয়া কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করেন বিগ্রহপাল। বিবাহ বোধহয় রাঢ়দেশেই হইয়াছিল। পাইকোড়ের লিপি হইতে মনে হয় চেদীরাজ সেখানে কোনও দেববিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগের ঘটনা।'' (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের চিঠি, ২১ চৈত্র ১৩৬১, *গ্রন্থ-পরিচয়, তুমি সন্ধ্যার মেঘ, শরদিন্দু অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬১৩-১৪।

১০। *ভূমিকা, তুমি সন্ধ্যার মেঘ, শরদিন্দু অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৭।

১১। *তুমি সন্ধ্যার মেঘ, শরদিন্দু অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭২।

১২। ঐ, পৃষ্ঠা-২৭১।

১৩। ঐ, পৃষ্ঠা-২৮৩। শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর সত্যই তিব্বতী অগ্নিকন্দুক তৈরির গুপ্তবিদ্যা শেখার জন্যে তিব্বতে যাত্রা করেছিলেন কিনা ইতিহাস তার নির্জলা সাক্ষ্য দেয় না। তবে এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে লেখকের দেশভক্তি যে বিলক্ষণ প্রকাশিত তাতে সন্দেহ নেই। শরদিন্দু অবশ্য ঐতিহাসিক সত্যরক্ষার জন্য জানিয়েছেন : ''বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে দীপঙ্কর অল্পকাল মধ্যেই তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন; তারপর সেখানে ত্রয়োদশ বর্ষ যাপন করিয়া সেইখানেই দেহরক্ষা করেন, আর ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। তিনি গূঢ়বিদ্যা শিখিয়াছিলেন কিনা এবং শিখিয়া থাকিলে কেন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন না এ সম্বন্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব।'' (ঐ, পৃষ্ঠা-২৮৮)।

১৪। ঐ, পৃষ্ঠা-২৬৯।

১৫। *ভূমিকা, তুঙ্গভদ্রার তীরে, শরদিন্দু অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৩।

১৬। *তুঙ্গভদ্রার তীরে, শরদিন্দু অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৫।

১৭। *তুঙ্গভদ্রার তীরে* যে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস, তাতে নিশ্চিত ছিলেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। তিনি বলেছেন :

''আপনি বিজয়নগরের অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়ে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন— এজন্য আমরা অর্থাৎ ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ— কারণ লোকে ইতিহাস পড়ে না— কিন্তু আপনার বই পড়িবে। Alexander Dumas যে উদ্দেশ্য নিয়া Three Musketeers প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন আপনার দুইখানি উপন্যাসের মধ্য দিয়া তেমনি শশাঙ্কের পরবর্তী সময়কার বাংলা ও দেবরায়ের বিজয়নগর সম্বন্ধে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।'' (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রমেশচন্দ্র মজুমদারের চিঠি, ২৬ নভেম্বর, ১৯৬৫, *গ্রন্থ-পরিচয়, তুঙ্গভদ্রার তীরে, শরদিন্দু অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬১৬।

১৮। ঐ, পৃষ্ঠা-৪৯১।

১৯। ঐ, পৃষ্ঠা-৫৩০।

(লেখক অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

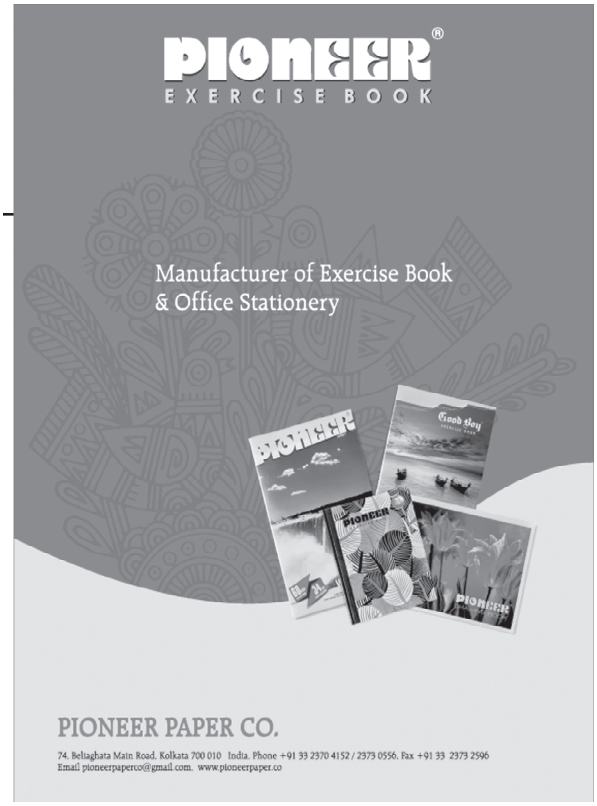

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই
ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

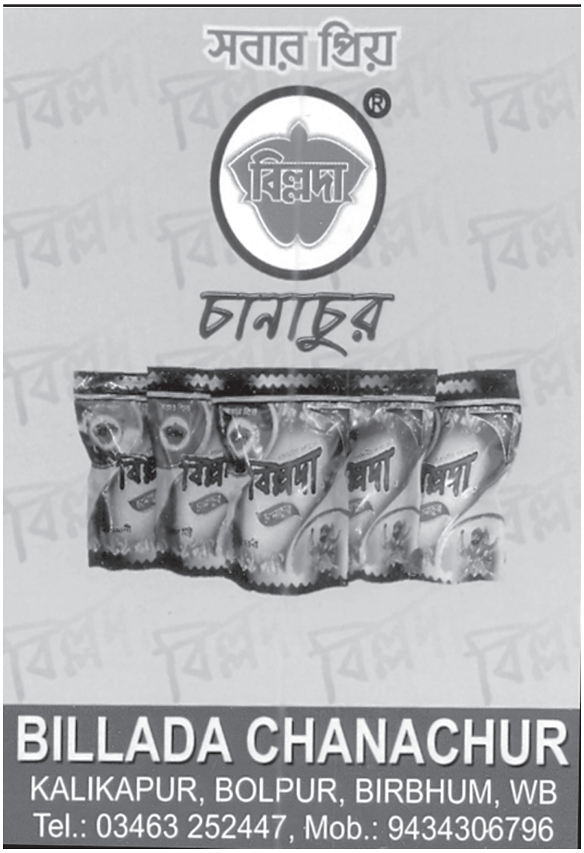

ভালোবাসার খোঁজে

রমানাথ রায়

সুজিত অফিসে বসে ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করছিল। এমন সময় শ্যামলের ফোন এল। শ্যামল এই অফিসে কাজ করে। একতলায় রিসেপশন-এ বসে ভিড় সামলায়। তার ওপর কড়া নির্দেশ, কেউ যেন না বলে কয়ে অফিসের ভিতরে ঢোকে।

সুজিত ফোন ধরে বলল, হ্যালো...

—মহিলা না পুরুষ?

—মহিলা।

—দেখা করার কারণ জিজ্ঞেস করেছ?

—করেছি।

—কী বলছে?

—বলছে কারণটা ব্যক্তিগত।

—ঠিক আছে। পাঠিয়ে দাও। —বলে সুজিত রিসিভার নামিয়ে রাখল। একটু পরে একটি মেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, বসতে পারি?

সুজিত বলল, বসুন।

মেয়েটি সুজিতের সামনে বসল।

সুজিত মেয়েটিকে চেনে। তাদের ফ্ল্যাট-বাড়ির পাশের ফ্ল্যাট-বাড়িতে থাকে। মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখা হয়। তবে মেয়েটির নাম সে জানে না। নামটা জানা দরকার।

কিন্তু নাম জিজ্ঞেস করার আগেই মেয়েটি বলল, আমার নাম কঙ্কা। আমি আপনাদের ফ্ল্যাট-বাড়ির পাশের ফ্ল্যাট-বাড়িতে থাকি।

সুজিত হেসে বলল, আমি তা জানি।

কঙ্কা তা শুনে বলল, তাহলে ভালোই হলো। —বলে একটু থেমে বলল, আমি বিশেষ সমস্যায় পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

সুজিত জানতে চাইল, কীসের সমস্যা?

—সমস্যাটা জটিল।

—আমি কি আপনার এই জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারব?

—পারবেন। আপনিই একমাত্র এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

—সমস্যাটা কী?

—আমি আপনাকে ভালোবাসা দিতে এসেছি। দিনরাত শুধু আপনার কথা ভাবি। স্বপ্নেও আপনাকে দেখতে পাই। খুব মানসিক অশান্তিতে আমার দিন কাটছে। কী করব বুঝতে পারছি না। আপনি এখন আমাকে এই অশান্তির হাত থেকে উদ্ধার করুন।

এই কথায় সুজিত বিস্মিত হলো। কোনও মেয়ে যে এভাবে অফিসে এসে ভালোবাসা দিতে পারে তা তার জানা ছিল না। তাই কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইল। তার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

কঙ্কা করুণ মুখ করে জিজ্ঞেস করল, চুপ করে আছেন কেন? কিছু বলুন।

সুজিত এবার জিজ্ঞেস করল, আমি আপনাকে কীভাবে উদ্ধার করব?

কঙ্কা বলল, আমাকে আপনার ভালোবাসা দিয়ে উদ্ধার করুন।

—ভেবে দেখি। —বলে সুজিত চুপ করে গেল।

কঙ্কা বলল, ভাবুন। তবে বেশি সময় নেবেন না। —বলে একটা কাগজে তার নাম আর মোবাইল নাম্বার লিখে সুজিতের হাতে তুলে দিল। দিয়ে বলল, 'আমি আপনার ভালোবাসা পাবার জন্যে অস্থির হয়ে আছি। আপনার ভালোবাসা না পেলে আমি কিন্তু আত্মহত্যা করব। আর এই আত্মহত্যার জন্যে আপনি দায়ি থাকবেন।

সুজিত একথা শুনে ভয় পেয়ে গেল। তার গলা শুকিয়ে গেল। কী বলবে খুঁজে না পেয়ে বলল, কিন্তু...মানে...আমি...

কঙ্কা এবার উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বলল, আপনার কোনও ওজর-আপত্তি শুনব না। আমি আপনাকে একসপ্তাহ সময় দিলাম। এর মধ্যে আপনার ফোন চাই। —বলে কঙ্কা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সুজিত পড়ে গেল সমস্যায়। তার মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে গেল। এখন সে কী করবে তা বুঝে পেল না।

২

বউদি পাড়ার সব মেয়েদের চেনে। সকলের সঙ্গে তার পচিচয়।

সুজিত ঘরে ফিরে বউদিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কঙ্কাকে চেনো?

বউদি বলল, হ্যাঁ, আমি কঙ্কাকে চিনি। কঙ্কা একদিন তোমার খোঁজখবর নিচ্ছিল। এমনকী কোন অফিসে কাজ কর তাও জিজ্ঞেস করল।

সুজিত বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি সব বলে দিলে?

বউদি বলল, হাঁ, সব বলেছি। কী হয়েছে তাতে?

উত্তরে সুজিত বলল, তাতে হয়নি কিছুই। তবে আমি সমস্যায় পড়েছি।

বউদি অবাক হয়ে জানতে চাইল, কীসের সমস্যা?

সুজিত বলল, কঙ্কা আজ আমার অফিসে এসেছিল।

—কেন?

—একটা কথা জানাতে।

—কী কথা?

বউদিকে সবকথা জানানো যায়। জানালে কোনও দোষ হয় না। তাই সুজিত বলল, কঙ্কা অফিসে এসে আমাকে ভালোবাসা দিল। বিনিময়ে তাকে ভালোবাসা দিতে হবে। না দিলে আত্মহত্যা করবে। আর এই আত্মহত্যার জন্যে আমি দায়ি থাকব। আমি মহাসমস্যায় পড়ে গেছি। আমি এখন ভালোবাসা কোথায় পাই?

বউদি হেসে বলল, ভালোবাসা সব দোকানে পাওয়া যায়। চাইলেই দেবে। 'ভালোবাসা' সাবান, 'ভালোবাসা' নেলপালিশ, 'ভালোবাসা' সেন্ট, 'ভালোবাসা' চানাচুর— কোন 'ভালোবাসা' চাই তোমার?

সুজিত বউদির কথায় আশ্বস্ত হয়ে বলল, তাহলে তাই একটা কিনে দিয়ে আসব।

বউদি বলল, হাঁ, তাই দিয়ে এসো। —বলে একটু থেমে বউদি জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কঙ্কা তোমাকে কী ভালোবাসা দিল?

সুজিত বলল, কোনও 'ভালোবাসা' আমাকে দেয়নি। শুধু মুখে বলেছে, আমি আপনাকে ভালোবাসা দিতে এসেছি। এখন আপনার ভালোবাসা পাবার জন্যে অস্থির হয়ে আছি। শুধু তাই নয়, আমাকে এক সপ্তাহ সময় দিয়েছে। এর মধ্যে তাকে ভালোবাসা দিতে হবে। মোবাইল নাম্বারও দিয়ে গেছে। এই নাম্বারে ফোন করে তাকে ভালোবাসা দিতে হবে। না দিতে পারলে আত্মহত্যা করবে। অথচ আমি তো কোনও ভালোবাসা পেলাম না। না পেলেও তাকে ভালোবাসা দিতে হবে। বুঝতে পারছ কী সমস্যায় পড়েছি।

বউদি হেসে বলল, বুঝতে পারছি।

সুজিত বলল, এখন কী উপায় বলো।

বউদি বলল, দু'টো উপায় আছে।

—কী উপায়।

—তুমি দোকান থেকে একটা 'ভালোবাসা' কিনে কঙ্কার হাতে তুলে দিতে পারো। নইলে সোসাসুজি ভালোবাসা পাওয়ার কথা অস্বীকার করো। বলে দাও, তুমি ওর কোনও ভালোবাসা পাওনি। তাহলে ল্যাটা চুকে যাবে।

সুজিত ভেবে দেখল, পয়সা খরচ করে কঙ্কাকে 'ভালোবাসা' দেওয়ার কোনও মানে হয় না। তার চেয়ে বলে দেওয়া ভালো, আমি কোনও ভালোবাসা পাইনি। অতএব ভালোবাসা দেওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু কঙ্কা যদি বলে, আমি ভালোবাসা দিয়েছি। আপনি সেটা হারিয়ে ফেলেছেন। খুঁজে দেখুন ঠিক পেয়ে যাবেন। তখন সে কোথায় ভালোবাসা খুঁজবে! কোথায় পাবে ভালোবাসা।

সুজিত আর কথা বাড়ালো না। চুপ করে ভাবতে লাগল। ভাবতে লাগল কী করা যায়।

৩

দুদিন পরে সুজিত কঙ্কাকে ফোন করল। কঙ্কা ফোন ধরল।

—হ্যালো...

—আমি সুজিত বলছি।

—বলুন।

—আপনি আমাকে ভালোবাসা দিতে বলেছেন। তা দিতে আমার আপত্তি নেই।

—খুব ভালো কথা।

—কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে তো কোনও ভালোবাসা পাইনি।

—মিথ্যে কথা।

—মিথ্যে কথা নয়। সত্যি কথা বলছি।

—না, আপনি সত্যি কথা বলছেন না। সেদিন আমি নিজে গিয়ে আপনাকে ভালোবাসা দিয়ে এসেছি। অথচ আপনি বলছেন আপনি

ভালোবাসা পাননি। অদ্ভুত কথা!

—এটা অদ্ভুত কথা নয়। এটা সত্যি।

—এটা সত্যি নয়। আসলে আপনি আমার ভালোবাসাকে গুরুত্ব দেননি। আপনি ওটা আপনার জামার পকেটে বা টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছেন। কিংবা হারিয়ে ফেলেছেন। আপনি ভালো করে খুঁজে দেখুন। আর যদি পকেটমার হয়ে যায় তাহলে কিছু করার নেই। ভুল বললাম। আছে, করার আছে। আপনি থানায় চলে যান। ওখানে গিয়ে বলুন, আপনার ভালোবাসা হারিয়ে গেছে। ওটা উদ্ধার করে দিন।

—আমি থানায় যেতে চাই না। তার চেয়ে এক কাজ করুন।

—কী?

—আপনি আর একবার আমাকে ভালোবাসা দিন। দিলে আমি আপনাকে ভালোবাসা দেব।

—কী বলছেন আপনি! ভালোবাসা দেওয়া কি এতই সহজ!

—সহজ হয়তো নয়, কিন্তু কঠিনও নয়। আপনি ইচ্ছে করলে আবার আমাকে ভালোবাসা দিতে পারেন।

—তা হয়তো দিতে পারি। তবে তার আগে আপনি খুঁজে দেখুন। খুঁজে দেখুন কোথায় আমার ভালোবাসা রেখেছেন।

—ঠিক আছে, তাই দেখব।

—তবে খুঁজে পেলে আমাকে জানাবেন। না পেলেও জানাবেন।

—জানাব। —বলে সুজিত ফোনের সুইচ বন্ধ করে দিল। দিয়ে ভাবতে লাগল, মনে করতে লাগল সেদিন কী ঘটেছিল। তার মনে পড়ল, কঙ্কা সেদিন জিনসের প্যান্ট-শার্ট পরে এসেছিল। তার হাতে কিছু ছিল না। কাঁধে একটা লেডিজ ব্যাগ ছিল। খুব সুন্দর ব্যাগ। মুহূর্তের জন্যেও কঙ্কা সে ব্যাগ খোলেনি। খুলে কিছু বের করে তার হাতে তুলে দেয়নি। যদি ব্যাগ খুলে কিছু দিত তাহলে সে তা যত্ন করে রেখে দিত। হারিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠত না। আসলে ভালোবাসা ব্যাগের মধ্যেই ছিল। ব্যাগের ভিতর থেকে ভালোবাসা বের করতে ভুলে গেছে। ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এখনও হয়তো সেই ভালোবাসা ব্যাগের মধ্যেই পড়ে আছে। পড়ে আছে অবহেলায়।

কিন্তু কঙ্কার কি একবারও সেই ব্যাগ খোলার অবসর হয়নি? না হতেই পারে। কারণ, মেয়েদের লেডিজ ব্যাগ তো একটা থাকে না, অনেক থাকে। এই ব্যাগটা হয়তো ঘরে ফিরে আলমারির ভিতর তুলে রেখেছে। রেখে অন্য ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। হ্যাঁ, এটা হতে পারে। এটা অসম্ভব কিছু নয়।

সুজিত বউদিকে কথাটা বলল। বলতেই বউদি বলল, ঠিক বলেছ। এটাই হয়েছে। তুমি একসময় কঙ্কাকে ফোন করে কথাটা বলো।

সুজিত বলল, তাই বলব।

৪

বলব ঠিকই। তবে তার আগে আমার খুঁজে দেখা দরকার। প্রথমে খুঁজতে হবে অফিস। আমি খুঁজতে শুরু করলাম। টেবিলের ড্রয়ার খুঁজলাম। টেবিলের নিচে খুঁজলাম। আলমারি খুঁজলাম। অফিস ঘরের কোণে কোণে খুঁজলাম। টয়লেট রুমে ঢুকে খুঁজলাম। লিফটের মধ্যে খুঁজলাম। অফিসের ক্যান্টিনে খুঁজলাম। সিঁড়িতেও খুঁজলাম। না, কোথাও ভালোবাসা নেই। এখন আমার ফ্ল্যাটের মধ্যে খুঁজতে শুরু করলাম। বসার ঘর, শোবার ঘর, বাথরুম, আলমারি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন— কিছুই বাদ গেল না। এমনকী রেফ্রিজারেটারের ভিতর তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। না, কোথাও ভালোবাসা নেই। এতে দুঃখ করার কিছু নেই। আমি জানি, ভালো করেই জানি কঙ্কা ভালোবাসা দেয়নি। দিলে আমি ঠিক খুঁজে পেতাম।

আমি এবার কঙ্কাকে ফোন করলাম :

—হ্যালো...

—আমি আপনার ভালোবাসা খুঁজে পেলাম না। আমার মনে হচ্ছে আপনি ওটা বাড়িতে কোথাও রেখে দিয়েছেন। আমাকে দেননি। নিজে একবার খুঁজে দেখুন।

—তা দেখতে পারি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে...

—মনে হওয়ার কোনও দাম নেই। আপনাকে যা বলছি, শুনুন।

—ঠিক আছে। আমি খুঁজছি, কিন্তু যদি খুঁজে না পাই?

—না পেলে আমরা দুজনে মিলে তখন খুঁজতে শুরু করব।

—কোথায় খুঁজব?

—রাস্তায় ঘাটে— সর্বত্র।

—সেটা মন্দ নয়।

—তাহলে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনি এই মুহূর্ত থেকে খুঁজতে শুরু করুন। দেখুন কোথায় ভালোবাসা রেখেছেন। —বলে সুজিত ফোন বন্ধ করে দিল।

এবার কঙ্কা খুঁজতে শুরু করল। প্রথমে সে তার ব্যাগগুলো খুলে খুলে হাতড়াতে লাগল। তারপর বিছানার তোষক তুলে দেখতে লাগল। তারপর একে একে আলমারিতে, রেফ্রিজারেটরে, সোফাসেটের নিচে, দরজার পিছনে, ফুলদানির মধ্যে, গয়নার বাক্সে, রান্নাঘরে, বাথরুমে, ওয়াশিং মেশিনে ভালোবাসা খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথাও ভালোবাসা খুঁজে পেল না। না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ল। ভাবতে লাগল, ভালোবাসা তাহলে গেল কোথায়? হাত থেকে রাস্তায় পড়ে গেছে? নাকি সুজিতকে ভালোবাসা দিতে গিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দিয়েছে? কাকে দিয়েছে? বিপুলকে? বরুণকে? শ্যামলকে? বিজয়কে? না সে এদের কাউকে ভালোবাসা দেয়নি। এরা বরং তাকে ভালোবাসা দিতে এসেছিল। কেউ এনেছিল চানাচুর, কেউ এনেছিল সন্দেশ, কেউ এনেছিল লোমপাঁপড়ি, কেউ এনেছিল সাবান। সে কারও ভালোবাসা নেয়নি। সে সকলের ভালোবাসা ফিরিয়ে দিয়েছে। একমাত্র সুজিত তাকে কিছু দেয়নি। না দিলেও সে নিজেই উপযাচক হয়ে ভালোবাসা তুলে দিতে গিয়েছিল। অথচ সেই ভালোবাসা সুজিতকে দেওয়া হয়নি। দিলেও সুজিত তা পায়নি। সুজিত তাই বলছে। সুজিতের কথা ফেলা যায় না। সুজিত মনে হয় ঠিক কথা বলেছে। দোষ তারই। সে-ই ভালোবাসা দিতে গিয়ে ভালোবাসা দিতে পারেনি।

এখন তাহলে কী করবে? কঙ্কা ভাবতে লাগল। সুজিতের হাতে ভালোবাসা তুলে দিতে হবে। না দিলে সুজিত তাকে ভালোবাসা দেবে না।

কঙ্কার এখন ভালোবাসা চাই। নইলে সে কিছুতেই শান্তি পাবে না।

৫

কঙ্কা একদিন সুজিতকে ফোন করল :

—হ্যালো...

—কোথাও ভালোবাসা পেলাম না। খুব অশান্তিতে আছি।

—তাহলে কী করবেন এখন?

—আপনি নিজে ভালোবাসা এনে আমাকে দিন।

—আমি কোথায় ভালোবাসা পাব?

—পাবেন, ঠিক পাবেন। একটু চেষ্টা করে দেখুন।

—আমি একা ভালোবাসা খুঁজতে পারব না। আপনি যদি সঙ্গে থাকেন তাহলে ভালোবাসা খুঁজতে পারব। আপনি কি সঙ্গে থাকবেন?

—থাকব।

তারপর দুজনে একদিন ভালোবাসার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সুজিত জিজ্ঞেস করল :

—'ভালোবাসা' সাবান নেবেন?

কঙ্কা বলল, না।

—'ভালোবাসা' সেন্ট?

কঙ্কা বলল, না।

—তাহলে কী নেবেন?

কঙ্কা বলল, ভালোবাসা।

—সেটা কোথায় পাওয়া যায়?

কঙ্কা বলল, তা জানি না।

—আপনি কোত্থেকে পেয়েছিলেন?

—ভুলে গেছি।

—তাহলে এখন কী করব?

কঙ্কা বলল, খুঁজতে হবে।

—কোথায়?

কঙ্কা বলল, সব জায়গায়।

তারপর তারা আগের মতো ভালোবাসা খুঁজতে লাগল। ■

বুরুজ

শেখর সেনগুপ্ত

সময়ের ভেলোসিটিকে গুরুত্ব না দিয়েও এ জায়গার যে ভৌগোলিক বিবরণ আমি দিচ্ছি, তাকে মোটামুটি নির্ভুল বলতে পারেন। অনেক-অনেক বছর আগে আমি কয়েকজন নকশাল জিগরি দোস্তের সঙ্গে ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম। পালা করে প্রতিরাতে এক-একজন চৌকিদারের দায়িত্ব সামলেছি সম্ভাব্য পুলিশি হানা এড়াতে। তখন ওই ঘটনাটা ঘটে— যার সঙ্গে আমরা কেউই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও অনুমান করতে পারি সব। ষাঁড়াষাঁড়ি বানের মতো বছরগুলি অতীত হয়ে গেল। কুশীলবদের কেউ কেউ আজও হয়তো জীবিত এবং গল্পের বিষয়বস্তু যদি ঘটনাক্রমে তাঁদের গোচরে এসে যায়, আজও তাঁদের চোখগুলি অর্থহীনভাবে চক্কর কাটবে না। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রস ও রহস্যের গ্রন্থিমোচনে পিছনের দিকে ছুটলেও ছুটতে পারেন। সেই শ্রীযুক্তা নিনা ভাট, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরপ্রসাদ ভাট, তরুণ কোচোয়ান রতু পাশোয়ান, পুরসভার চেয়ারম্যান রামশরণ মিশ্র— হয়তো এঁরা সকলেই আজও ওই এলাকার খাস আদমি হয়েই আছেন, যদিও আলগোছেও কোনও আন্দোলনের শামিল হওয়া ওঁদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আমি নিজেই আজ বয়সের চাপে শিথিল। কোনও ব্যাপারে নিমেষে সিদ্ধান্ত নিতে অসমর্থ। নেহাত আবাল্য তাগিদ, তাই প্রয়াস সম্পূর্ণ স্তিমিত হয়ে যায়নি— কম্পিউটারের বদলে কলম ব্যবহারেই অভ্যস্ত। ঢিল একটা কোনওরকমে ছুঁড়ছি দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হবে না বুঝেই।

টুকটাক বিবরণ দিচ্ছি অকুস্থলের। ব্রিটিশ শাসনের মধ্যপর্ব প্রায় শেষ। হাওড়া থেকে বেনারস যাবার রেললাইন পাতা হচ্ছে। ফলে এই জায়গাটার গুরুত্ব ও মহিমা আরও বাড়ল। সরকারি মেহেরবানিতে ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে এখানে একটি ভদ্রগোছের রেলস্টেশনও গড়া হলো। এর মানে কিন্তু এই নয় যে রেললাইন পাতার আগে এলাকাটা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। বরং বিলকুল বিপরীত। অনেককাল আগে থেকেই মানুষ এখানে নিয়মিত এসেছে। বড় কারণ মা গঙ্গা এখানে বুক চিরে বহমান। এছাড়া যাঁদের হাতের তালুতে আঁকা থাকে ইতিহাস, তাঁদের কথা তো ঘুরে-ফিরে এর প্রসঙ্গে আসতে বাধ্য। একদা ঘোড়ায় চেপে তলোয়ার উঁচিয়ে বীরপুরুষরা আসতেন। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নাম জড়িয়ে আছে। তারপর পাঠান নায়ক শেরশাহ। বহু কাহিনি, গৌরব, রাজনৈতিক মতিগতি নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বেজারমুখে একটি অতিকায় দুর্গ— নিয়মিত পরিচর্যায় যার জেল্লাকে রক্ষা করবার চেষ্টা অব্যাহত। দুর্গের অদূরে ঝাড়া হাত-পা নিয়ে একটি বুরুজ— যার কোনও জলবৎ ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই। আকর্ষণও কথঞ্চিৎ।

দুর্গের কয়েক ফার্লং-এর মধ্যে দাঁড়িয়েও বুরুজটা কেন ন্যূনতম খাতির বহুকাল পায়নি সেটা এক রহস্য। পরে অবশ্য এ গল্পের অন্যতমা নিনা ভাট পুরসভার ছক-সমীকরণ বদলে সত্তর ফিট উঁচু গম্বুজটার সংস্কার করেন। রঙের প্রলেপ লাগে। নিজের শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে তিনি প্রায় দিন ওই মনুমেন্টের মাথায় গিয়ে উঠতেন। হু হু বাতাস সাপুড়ের বাঁশি বাজাত। নীচে দাঁড়িয়ে প্রৌঢ় বিজনেস ম্যাগনেট বাবু ঈশ্বর ভাট মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন তাঁর অপরূপা স্ত্রীকে— এ নারীকে চেনা-জানার পরিধির মধ্যে আনা যায় না। সময়ের উত্থান-পতন বোঝাপড়া সবকিছুর ঊর্ধ্বে ওই জননী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন এই রকম ভাব তরঙ্গ, ঠিক তখনই একটা দু' চাকার টাঙা সশব্দে পেরিয়ে যাচ্ছে দুর্গটাকে। একেবারে অকারণে বাতাসে চাবুক ঘোরায় কোচোয়ান রতু পাশোয়ান। ঘোড়াটা প্রাণপণে চেষ্টা করছে এ যাত্রায় সেই চাবুকের সাময়িক যন্ত্রণাকে এড়াতে।

বুরুজের কলি ফেরাবার কথা বহু বছর ধরে কেউ ভাবেননি। আসলে নিনা ভাটের আবির্ভাবের এক দশক আগেও এখানে ছিল প্রায় গ্রামীণ প্রশাসন। হরেক কিসিমের গেঁয়ো প্রতিশ্রুতির মধ্যে বুরুজ নিয়ে কিছু বলাটাই ছিল বিপ্রতীপ স্রোতে ভাসবার শামিল। সরপঞ্চের মাথায় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তো সমালোচনার ঊর্ধ্বে। অভিযোগ যিনি করবেন, পুলিশ তাঁকে রেয়াত করবে না। ধরপাকড় আকছার। কিছু বিপজ্জনক প্রতিবাদীর বাড়ি তছনছও করা হয়েছে। পরে জায়গাটা আর তেমন আতুর হয়ে থাকেনি। ঘরবাড়ির সংখ্যা বেড়েছে, হাটে-বাজারে কে কাকে টেক্কা দেবে, তার মহড়াও শুরু, আজ যে বিজয়ী কাল সে পরাজিত। সরপঞ্চের যুগ শেষ। গঠিত হয়েছে পুরসভা। একই রাজনৈতিক পৈঠায় দাঁড়িয়ে গোষ্ঠীকোন্দল। সবকিছু

ছাপিয়ে এই জমির গুণকীর্তন সর্বভারতীয় রূপ নেয়। এখানকার ইঁদারার জল গলা দিয়ে নামলে যাবতীয় হজমের দোষ মুহূর্তে সাফ। দুটো চুনা পাথরে গড়া পাহাড়ের মালিক বাঙালি ব্যবসায়ী শচীন ভট্টাচার্য মওকা বুঝে চারটে রিসর্টও গড়ে ফেললেন গঙ্গাকে পশ্চিমে রেখে। স্বাস্থ্যসন্ধানী বাবুদের আগমন-নির্গমন হিংসে করবার মতো। তিন-তিনটে বড় ও মাঝারি মাপের বাজার। মছলি বিক্রেতারাও আজকাল গলা ছেড়ে খদ্দের ডাকে। রাতের বয়স না বাড়লে ভিড় পাতলা হয় না। মধ্যযামে অবশ্য এক পাগলির কান্না-জড়ানো বিলাপ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

সুতরাং প্রশাসনের খোলনলচে বদলানো হলো। পুরসভার বিল্ডিংটি চমৎকার। তার চেয়েও আকর্ষক ওই পুরসভার একমাত্র মহিলা কাউন্সিলর শ্রীযুক্ত নিনা ভাট, বি এস সি।

ধরে নিন, জায়গাটার নাম ঢোলপুর। তিনটি মার্কেটের মধ্যে সবচেয়ে জমজমাট ফোর্ট মার্কেট। ফোর্টের মিলিটারি ক্যাম্পের মালপত্তরও প্রতিদিন ওই মার্কেট থেকে আসে। আর তা সাপ্লাই করে ঈশ্বর ভাট ১৯৬৯ সনেই লাখপতি। নির্ভয়ে ব্যবসা করেন। মাঝে মাঝে থানায় ঢুকে খোদ বড়বাবুর সঙ্গে খেজুড়ে আলাপ সেরে আসেন। এর চেয়েও বড় কথা, নিনা ভাটকে তিনি তেরো বছর আগে শাদি করে এনেছেন বেনারস থেকে। তারপর বছরের পর বছর হাত কামড়ান। মুখোমুখি হলেই খিটিমিটি। যতদূর সম্ভব, একজন অন্যজনকে এড়িয়ে চলেন।

তিক্ততার কারণ অনেকে জানে। আমি পরে আপনাদের তা জানাব। এখন বলি ঈশ্বর ভাট কোনও ধনী বা সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আসেননি। তিনি ম্যাট্রিকটাও টপকাতে পারেননি। কারবারের শুরুটা তাঁর ৫৩ টাকার মূলধন নিয়ে। আর এখন— আহ, সেই মানুষের বাণিজ্য- অন্তঃপুরের বিস্তৃত হদিশ পেলে সম্মোহিত হবার উপক্রম। সাপ্লাই অ্যান্ড সাপ্লাই, আলপিন টু অ্যালিফেন্ট— হোয়াট নট! সারা শহরে যে পাঁচটা চারচাকা দাপটে ঘোরে, তার একটার মালিকানা এনার। থলথলে দেহ, চুল পাতলা, রঙ তেলতেলে তামাটে, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, প্রতিটি দিন নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা, সামাজিক দায় বহনে উৎসাহ নিতান্ত কম, বাণিজ্যিক জ্যামিতি নিয়েই সপ্তাহের ছয়দিন ব্যস্ত থাকলেও রবিবার দিন দাবা খেলার সঙ্গী খুঁজতে বের হন আর তখনই কোনও কোনও বিশেষ লোকের সঙ্গে তাঁর মুলাকাত ও সান্নিধ্য। এই লোকের ঘরনি নিনা ভাট। জীবনে ওই একটাই ব্যর্থতা ঈশ্বরের। রাগে আক্ষেপে ন্যক্কারজনক ভাষা বেরিয়ে আসতে চায়। পয়সার জোরে বেশি বয়সে এই বেনারসি বিদূষী হুরিকে তাঁর হারেমে এনে ঢুকিয়ে ছিলেন বাল-বাচ্চায় ঘর ভরাবেন বলে। সে আশা বিলকুল বরবাদ। একটা ছানাকেও পয়দা করতে পারল না আজ পর্যন্ত। উল্টে মরদকে তুড়িতে উড়িয়ে দুনিয়া কাঁপাচ্ছে। শাসক দলের একমাত্র মহিলা কাউন্সিলার। আর তিন থেকে চার বছরের মধ্যে মেনস বন্ধ হবেই। ব্যাস, ভাট পরিবারের খেল খতম। ঈশ্বর ভাটের ঔরসজাত বেটা-বেটি বলতে এ দুনিয়ায় আর কেউ থাকবে না। দুসরা শাদির কথাও ভাবতে গেলে ভয়ঙ্কর এক বিভীষিকা! শাসক দলের মস্তানরা নিনাদিদির উস্কানিতে ওঁর তলার থলেটাকেই কেটে নিয়ে গিয়ে ফুটবল খেলবে। তাই কোথাও নরম কথা নেই, সোহাগ নেই। যদিও বা কালেভদ্রে বিছানায় ঝড় ওঠে, কাজ শেষ হতেই শরীর এমন ঘোলায় যেন পেট প্রেশার হার্টের রোগে আর বিছানা থেকে নেমে আসতে পারবেন না ঈশ্বর ভাট।

ওই দেখুন, স্টেশন চত্বরে ঢোকার মুখে ডান দিকে একটা কত বড় সাইকেলস্ট্যান্ড। কম সে কম খান তিরিশেক সাইকেল চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। নিরাপদ আশ্রয়। পার সাইকেল ঢোকাতে হয় এক আনা দক্ষিণায়। তিরিশটি দু' চাকার মধ্যে তেরোটি গুঁজে দিয়ে গেছে ঈশ্বর ভাটের তেরোজন কর্মচারী। তারা এখানে সাইকেল জমা রেখে ট্রেনে চেপে এদিক ওদিক ছোটে অর্ডারি মাল নিয়ে আসতে। দিনের শেষে সব মালের হিসেব নেন খুশ মেজাজের ঈশ্বর। একবার এক নাটকদলের বরাত পেয়ে সুদূর সাঁওতাল পরগনা থেকে আনিয়েছিলেন ধামসা মাদল অবধি। নাটক হয়েছিল ভালোই। যে কর্মচারীর ধকল বেশি হয়েছিল, তাকে চা নাস্তা বাবদ কিছু বেশি পয়সাও দিয়েছিলেন।

অন্তরীক্ষে কার্তিক ঠাকুরের মুচকি হাসি। ঈশ্বর, মাল তুই যতই কামা, ভেতরটা তোর শুখা থাকবেই। তোর অবস্থাটা জরিপ করবার জন্য চোখে দূরবিন লাগাবার দরকার হয় না। সামান্য কান পাতলেই শোনা যাবে কাটা কাটা বিষবাক্যের প্রপাত রব। তোমার কী জরায়ু বলতে কিছু আছে? প্রকৃতি-পাগল জননেত্রীর পাল্টা জিজ্ঞাসা, তোমাকে ঘাঁটলে একটাও শুক্রকীট বের হবে কী? কথার পিঠে কথা। ইন্তেজার করতে করতে বাণপ্রস্থে পা রাখা হবে, তবুও দু'জনের একজনও গাইনিকের কাছে যাবেন না। ডাক্তার সূর্য পাণ্ডা নিজেই একদিন এসেছিলেন ভাটদের প্রাসাদে। ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। ফল হয়নি। রুটি-কষামাংস খেয়ে পাইপে তামাক ঠুসে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে বেরিয়ে গেলেন। দু'জনেরই মনে ভীতির স্পার্ক। দোষটা যে কার—

যে সময় ও পরিবেশের কথা, তখন এক সক্ষম মরদ সন্তর্পণে দুসরা শাদি করলেও করতে পারে। কিন্তু সেখানেও আতঙ্ক। নিনা ভাটের তো ঢাউস প্রতিপত্তি। বেনারসের কন্যা, বিজ্ঞানে ডিগ্রি, এমন রূপ-যৌবন, কোনও দিন বুঝি বার্ধক্যই আসবে না, প্রতিপক্ষকে খোঁচা মেরে ভাষণ দিতে পারঙ্গমা, শাসকদলের একমাত্র লেডি কাউন্সিলর, তাঁর সঙ্গে দিল্লাগি মারবার সাহস কারোর নেই, তাঁর তদারকি কাজে খুঁত ধরা অসম্ভব... ঈশ্বর ভাট দুসরা শাদির কথা ভাবতে পারেন না। একান্ত নিরুপায়।

এবারের বিদায়ী শীতে চল্লিশে পা রাখলেন নিনা। রাজনীতির কল্যাণে পরিচিতি বেড়েছে। তল্লাটে তাকে কে না চেনে? হাস্যময়ী। ঝুটা আশ্বাস দেন না। যে কাজে হাত দেন, সেটাই গঠনমূলক। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করায় কসুর নেই।

ফোর্টে ওঠার পথে সাদা নুড়ি তাঁরই হুকুমে বিছানো হয়। তাই বলে নির্বিষ নন। প্রতিটি ভাষণে বিরোধীদের জাত তুলে এমন সমস্ত মন্তব্য করেন যে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়তে বাধ্য। সামনের বিধানসভা ইলেকশনে তিনি যে প্রার্থী হতে চলেছেন, এ নিয়ে সন্দেহের কানাকড়ি থাকাটাও অনুচিত।

হয়তো বেশি কথা বলে ফেললাম। আসলে এটা তো ঠিক বলা নয়। অনেকখানি স্মৃতিচিত্রণ। আবেগ এলে কূলকিনারা হারাই, অযাচিতভাবে বেশি কথা লিখে ফেলি— যেগুলি নিটোল কাহিনি গড়ার পথে বিধিবাম। সময়ের ডালপালা ছেঁটে পৌঁছে গেলাম ১৯৭০। ডিসেম্বর মাস। তখন আমার খুব খুশিয়াল সময়। ভালো চাকরি পেয়েছি। সব দিকে আলোর তাপ। তিমির বলতে কিছু নেই। ওই অবস্থাতেও লুকিয়ে চুরিয়ে নকশাল বন্ধুদের সাহায্য করি। তাদের কয়েকজনকে নিয়ে এলাম এখানে— এ গল্পের অকুস্থলে। কলকাতায় যে হরিফাইং সিচুয়েশনে থাকতে হতো, এখানে তার অভাব। ঢোলপুর স্টেশনে যারা

ট্রেন থেকে নামেন, তাঁদের বেশিরভাগই একে-অপরকে মোটামুটি চেনেন। বিকেল পাঁচটা বাজতে না বাজতেই দাপুটে সূর্য এক পুওর ফেলো। টাঙাওয়ালাদের বেশিরভাগ ঘোড়া ঢুকে গিয়েছে আস্তাবলে। ঝাঁটপাট দিয়ে দারুণ আসর বসিয়েছে কেউ কেউ। পাতি পলিটিক্যাল তরজা ছাড়া কিছু নেই। ইতিউতি ভেপারের আলো। হি হি কাঁপনে দাতকপাটি। মাত্র গুটিকয়েক চলন্ত টাঙার খণ্ড খণ্ড ছায়া।... ওই রকম এক কালে স্টেশনের বাইরে অপেক্ষমান মাত্র তিনটে টাঙা। দুটো টাঙার প্যারাপিটে বসে বিড়ি টানছে দুই ঝানু কোচোয়ান। তৃতীয় টাঙার চালককে কিন্তু কোচোয়ান বলে মনে হয় না। অপর দু'জনের হাঁটুর বয়সি। চেহারায় এখনও এমন লালিত্য, যেন জীবনযুদ্ধে ঝাড় খেয়ে আদৌ ঘোড়ার লেজ ধরে ঝুলে পড়েনি। বেমক্কাই উঠে বসেছে টাঙা চালকের টঙে। ওর হাতে একটা খুদে ট্রানজিস্টারও— যেখানে এই মুহূর্তে স্বাস্থ্যসুরক্ষার বাঁধাবুলি কপচে চলেছে কার ভরাট গলা। রেডিওটাকে কানে রেখে সে পায়চারি করছে স্টেশনের সামনে সিমেন্ট বাঁধানো চত্বরে। একটু আগে তার পেয়ারের ঘোড়াটাকে আধো আধো গলায় আদর করেছে জীবটার অনুচ্চারিতভাবে পেশ করা নালিশ অনুভবে আসায়। সম্পর্কটা বেশি পুরনো নয়। এই তো সেদিন মাদাম নিনা ভাটের সুপারিশে ব্যাঙ্ক ঋণ জুটল ঘোড়া সমেত টাঙার মালিকানা হাসিল করতে। সেই সঙ্গে ইতিও টানা হলো তেতো দিনগুলির ওপর। অন্য টাঙাওয়ালারা বাগড়া দেবার সুযোগ পায়নি; অসহযোগিতার ফুরসতও নেই বললেই চলে, কারণ ছোকরার মাথার ওপর মাদামের বাঁ হাতখানা রয়েছে যে। দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়েছে পরিচিতি। এখন ঢোলপুরের অর্ধেক মানুষ তাকে চেনে। নাম রতু পাশোয়ান, বয়েসে ছোকরা বলা চলে, গায়ের রং দেখলে মনে হবে দোআঁশলা, অথচ জন্ম নিতান্ত অন্ত্যজ পরিবারে, বাপটা আজও ফোর্টের পশ্চিম কোণে বসে জুতো সারায়। এরকম বাড়িতে সুদর্শন ছেলেটা বেমানান নয়? দুই হাত দু' পাশে ছড়িয়ে যখন শ্বাস টানে, তাকেই একটা নতুন গম্বুজ বলে মনে হতে পারে। তেরো থেকে তেষট্টি— যে কোনও বয়সি মেয়ে-মহিলার চাউনিতে চমক। পরিচয় জানবার পর হয়তো স্ট্যাচুটার দিকে তাকিয়ে নাও থাকতে পারে।

রতু টাঙা দাঁড় করিয়ে তিন-তিনটে বিড়িকে ছাই করেছে। তারপর অপ্রকৃতিস্থের মতো এলোমেলো হাঁটাহাঁটি। তবে স্বভাবটা তো গায়ে-পড়া নয়, অবশ্যই অন্যরকম। যেমন পায়চারি করতে করতে এক সময় সে থিতু হয়ে গেল শিউলি গাছটার তলায়। গাছের গুড়িকে জড়িয়ে একখানা সাদা-সবুজ পোস্টারে মুখ্যমন্ত্রীর দন্তবিকশিত মুখাবয়ব। ভোটের দিন যত ঘনাবে, দন্তপাটির চিত্ররূপ তত ছড়াবে। সাড়ে চার বছর আগেও এ হাসিমুখের অন্যরকম তাৎপর্য ছিল না। এ বছরও হয়তো পরিবর্তনের সম্ভাবনা ক্ষীণ। লাঠি হাতে বৃদ্ধ বাপুজি ও তেরঙা পতাকাকে ঢাল বানিয়ে নিত্যদিন আড়ালে যা কিছু করা হয়, তাকে আর যাই হোক, নীতির রাজা কিংবা রাজার নীতি বলাটা হাস্যকর। তখনও এ দেশে টিভি আসেনি, কম্পিউটার আসেনি গুগলসার্চ বিলকুল অজানা। কিন্তু রাজনৈতিক প্রপাগান্ডার ওই ছেঁদোরূপ তখনও হেসেখেলে চলছে, চলবে।

পাশোয়ান আরও অনেকটা সময় শিউলিগাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে। শিউলির মিষ্টি গন্ধ আপন নিয়মে তার অস্থিরতা কমায়। মাত্র মাস কয়েক আগে তার এক্কাটা পথে নেমেছে। ওটার উদ্বোধন উপলক্ষে ছোটখাট একটা অনুষ্ঠানও হয়েছিল ঋণপ্রদানকারী ব্যাঙ্কের সামনে। ভাষণ দিয়েছিলেন কাউন্সিলর নিনা ভাট— যিনি বুঝি নিজের অজান্তেই একটু আবেগঘন হয়ে পড়েন, বাদামি রঙের শাড়ি তিরিতিরি উড়ছিল বাতাসের সোহাগে এবং দৃশ্যত তিনি ভোররাতের মোহিনী চাঁদ। তুলনায় ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের বক্তব্য ছিল রসকষহীন। তাঁর দুশ্চিন্তা,— রাজনীতির প্রভাবে প্রদত্ত এই লোন ঠিক ঠিক রিপেইড হবে তো? ঢোলপুরের তখন মুখ্য আলোচ্য বিষয়, চালচুলোহীন ওই রতুটা কীভাবে ব্যাঙ্কলোনটা বাগল? আর নিনা ভাটের মতো একজন

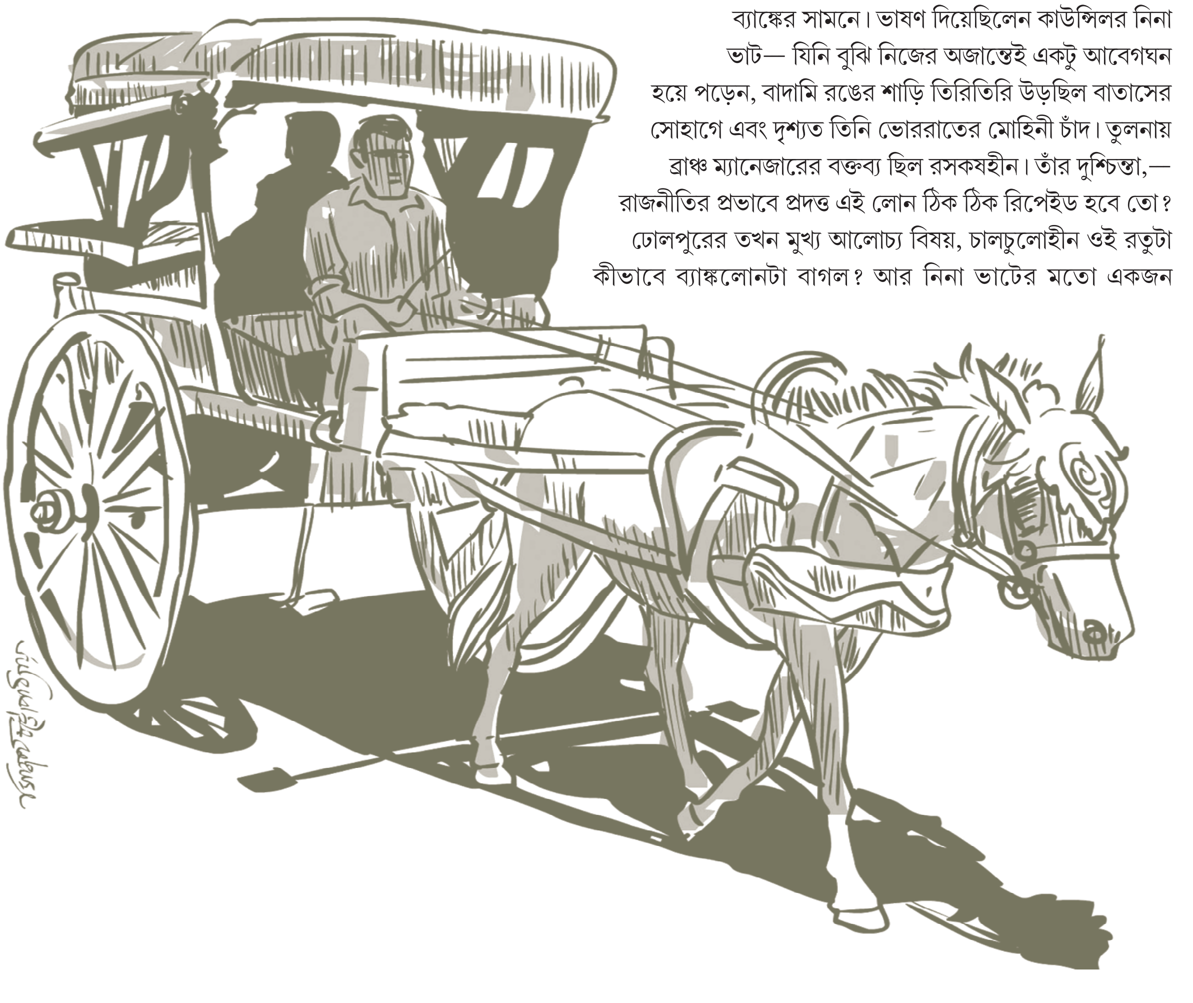

ডাকসাইটে পলিটিক্যাল লেডিকে সে কোন জাদুতে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সামনে এনে ফেলতে সমর্থ হলো? এই মহিলা যে কাজেই হাত দেন, একটা প্রচার ঢোলপুরে হবেই। হয়তো বার কয়েক ফোনালাপ, তার পরই দামি গাড়িতে ব্যাঙ্কে যখন হাজির হলেন, সে যেন অন্য জগতের পটভূমি। বেচারি ম্যানেজার। একে রাজনীতি, তার ওপর অমন একজন বিদূষী রূপসী। গমকে আর মিড়ে উড়ে গেল সিকিউরিটির প্রশ্ন।

এভাবেও লোন হয়।

এরকম ঋণে যখন এক্কা পথে নামে, তখন তার চাকার ঘর্ষণে ও ঘোড়ার পা ঠোকায় বড্ড আওয়াজ। নুড়ি পথেও্ লিঝড়।

এই সেই রতু পাশোয়ান। ঘটনার আবর্তে ওর দৈহিক জেল্লা আরও বেড়েছে। অথচ ওর বাপটা আজও দুর্গের পশ্চিম কোণে বসে মিলিটারি জোয়ানদের বুটগুলির কলি ফেরাতে মগ্ন। আজকাল আর পিঠ সোজা করে বসতে পারে না। নিনা ভাটেরও এক জোড়া ফুলকাটা চটির মেরামতি হয়েছে তার হাতে। পারলে তখন সে সেই জুতো কপালে ঠেকাতেও রাজি। পুরপতি রামশরণ মিশ্র তো বচনসম্রাট। নেহরুজির মৃত্যুর পর একটা জাঁকালো শোকসভা করেছিলেন পুরভাণ্ডারকে দুর্বল করে দিয়ে। পাবলিক ওয়ার্ক বলতে বোঝেন কেবল স্ফূর্তিফার্তা। নিনা ভাটই পেরেছেন এরকম একটা লোককে রাজি করিয়ে ঢোলপুরের প্রথম পাকা ইউরিন্যাল তৈরি করতে। পাবলিক খুশি। আরও কিছু উন্নয়নমূলক কাজ। সবাই করছে ধন্য ধন্য। ব্যতিক্রম কেবল একজন। তিনি মিসেস ভাটের হাজবেন্ড ঈশ্বর ভাট। লাখ টাকা মাসিক আয় হরেক কিসিমের ব্যবসায়ে। চটপট ধনী থেকে ধনীতর। এখন কোনও লোকেই তাঁকে মিসগাইডেড বলতে সাহস পাবে না। কেবল একটা চাপা আর্তরব মাঝে মাঝে শোনা যায়, ঈশ্বর ভাটের সঙ্গে নাকি রাজ্যের খোদ বিত্তমন্ত্রীর খুব দহরমমহরম। কিন্তু সেই লোক নিনা ভাটের মতো বেটারহাফে খুশি নন কেন? এ প্রশ্নের জবাবও অনেকের কাছে স্পষ্ট। আমিও শুনেছিলাম। রহস্যমোচন করতে একবার তাহলে ভাটপরিবারের অন্দরমহলে কান পাততে হয়। সেখানে সেই হাহাশ্বাস, —হায়, জীবন যে বড়ই অনিত্য!... স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখি হলেই খিটিমিটি।... মা ডাক শুনতে তোমার ইচ্ছে করে না? ...কুঁড়ে ঘর টুঁড়ে ডানাকাটা পরি নিয়ে এলাম।... কী নসিব! বাঁজা পরি!... মরদের কথাগুলি শুনে ঢোক গিলবেন, উৎকণ্ঠিত হবেন, নিনা ভাট তেমন মহিলা নন। বরং এনকাউন্টারে তিনি অনেক বেশি ধারাল, '...আবে, কসুর কিসকা হ্যায় বে? চ, ডক্টর কা পাস। ইসিবক্ত।...' কেঁচোর মুখে নুন। ঈশ্বরভাটের সমস্ত ভারচুয়াল, ভিসুয়াল তড়পানি শেষ। তাঁর আস্থার অভাব। যদি ডাক্তার...।

দুই

প্রতিটি ঘোড়ার কেরিয়ারে একাধিক মিথ থাকে। চিলেকোঠায় দাঁড়িয়ে ধাবমান অশ্বকে দেখলেই তা টের পাওয়া যায় না। যেমন রতু পাশোয়ানের এই ঘোড়াটা। এর জীবনের প্রথম মিথ হলো ঢোলপুরের সর্বত্র মাননীয়া নিনা ভাটকে সে প্রাত্যহিক সওয়ারি হিসেবে পেয়েছে। মিসেস ভাট আর পুরসভার চার চাকাতে চাপেন না। রতুর টাঙায় উঠতে না পারলে তাঁর স্বস্তি নেই। অশ্বক্ষুরের রবে তাঁর স্বপ্ন ও তন্ময়তা বাড়ে।

যেমন আজ। ম্যাডাম গিয়েছেন বেনারসে পারিবারিক শোকসভায় যোগ দিতে। ট্রেন লেট থাকায় ফিরতে দেরি হচ্ছে। কত দেরি হবে, শিব জানেন। অপেক্ষমানদের মধ্যে বার্তালাপ চলছে। হঠাৎই অনেককে হতচকিত করে ট্রেন এসে ঢুকল প্ল্যাটফর্মে। ম্যাডামকে দেখে ঘোড়াটা উত্তেজিত হয়ে পড়লেও রতু পাশোয়ান অস্বস্তি অনুভব করে। ম্যাডাম আজ এমন নজরে তাকে জরিপ করছেন কেন? নির্ঘাত শোকসভাতেও স্বামীর সঙ্গে টক্কর দিতে হয়েছে। ঈশ্বর ভাট তো এই ট্রেন থেকে নামলেন না। স্ত্রীর সঙ্গে আসতে অরুচি? পারস্পরিক তাচ্ছিল্যের কাটাকুটি? রতু পাশোয়ানের পাকযন্ত্রে আবর্তের সৃষ্টি হচ্ছে। মাননীয়া কেবল তাকে নতুনভাবে দেখছেন না, তার জন্য একটা চমৎকার লাল জামাও কিনে এনেছেন! স্খলিত স্বরে বললেন, 'বুরুজ মে চলো। উহা তুম ইয়ে পিরান...'।

রতু কিছু বলতে গিয়েও স্বর হারায়। ভেতরটা যে তার কেমন করছে, একমাত্র সেই টের পায় হাড়ে হাড়ে। আর কেউ নয়।

টাঙার চাকা ঘুরছে। ঘোড়াও ছুটছে। অথচ শব্দ নেই। রতুকে গ্রাস করে নিচ্ছে নিরেট নীরবতা। এমনকি কোচোয়ানের চাবুকটাও তার হাতে নেই। পরিবর্তে রয়েছে পাস্তার একটা প্যাকেট। নিনাদি দিয়েছেন। তাঁরই উদ্যোগে ঢোলপুরের বুরুজ নবরূপ ধারণ করে দ্রষ্টব্যের তালিকায় এসে গিয়েছে। তবে এখনও পুরপতি উদ্‌ঘাটন না করায় ওর অভ্যন্তরে প্রবেশ নিষেধ। তিন রকমের গথিক রীতিকে ম্যানিপুলেট করে নবনির্মিত। বিক্রমাদিত্য থেকে আরম্ভ করে শেরশাহ অবধি প্রত্যেকের আত্মাকে প্ল্যানচেট করে আনা হয়েছিল যেন। মনুমেন্টের পিছনে দু-পাঁচটা আস্তাকুঁড়ে যা ছিল, সব এখন গঙ্গাজলে সাফ। যা ছিল চেহারায় পাগলা-গারদ, সেই চিলেকোঠা আজ অরক্ষণীয়া প্রেমকুঞ্জ। কোনও এক অদৃশ্য সত্যান্বেষী কপাটে চোখ পেতে দেখছেন, শ্রীমতী নিনা ভাট নিজের হাতে লালকুর্তায় সাজাচ্ছেন তুচ্ছ কোচোয়ান রতু পাশোয়ানকে। ক্রমে সেই কুর্তা সমেতই যেন পতাকা উত্তোলন। নিনা ভাট একরকম অনুচ্চারিত শব্দে-নিঃশ্বাসে আশ্বস্ত করছেন ভীরু তরুণকে। আসছে-আসছে সুবর্ণ মুহূর্তগুলি। ঝকঝকে বেনারসি তাতে সাদা পাতলা বর্ডার নিচ্ছে ভূমিশয্যা। ঝুঁকে পড়ে বড় দুঃখী দুঃখী চোখে ভিখ মাঙছেন দেবী।

তিন

তারপর এক বছর পূর্ণ হতে আরও মাস দুয়েক বাকি। তামাম ঢোলপুর জুড়ে উল্লাস। ভাট পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর টানাপোড়েন বিলকুল উধাও। মস্ত অট্টালিকার বিশাল ডাইনিং স্পেসে মানুষের ঢেউয়ে টইটম্বুর। সকলেই ভি আই পি। চেয়ারম্যান মিশ্রজির জ্যাকেটের পকেট থেকেও উঁকি মারছে একটি খোকা বোতল। আশপাশের গাঁ-গঞ্জ থেকে ভাড়া করা মহিলারা এসেছেন পুরনো রীতি মেনে তালি বাজিয়ে গান গাইতে। বড় তীব্র ওই কোরাস। হবেই বা না কেন?

বাণিজ্যের কুলপতি, নিনা ভাটের পতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরপ্রসাদ ভাট নবজাতকের জনক হয়েছেন! আনন্দে তো নদীরও উত্তাল হয়ে ওঠার কথা।

পথে কিন্তু ঘুরন্ত চাবুকের শন্‌শন্ রব।

বনবনিয়ে ঘুরছে চাকা।

রতু পাশোয়ানের টাঙা ছুটছে।

কোনও প্যাসেঞ্জার আজ তাকে ডাকতে সাহস পাচ্ছে না।

টাঙাটা থেমে গেল বুরুজের সামনে। রতু পাশোয়ান নেমে এসে দু' হাত কোমরে রেখে শুরুজের চিলেকোঠার দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে। চোখ ফেটে রক্ত গড়াবার আশঙ্কা। ■

হার্ডিঞ্জ সাহেবের ঘড়ি

সন্দীপ চক্রবর্তী

চোখের সামনে মৃত্যুকে দেখার অনুভূতি হলো মৃদুলের। সারা শরীরে শিহরণ। রোমকূপ খাড়া। সে প্রাণপণে ডাকতে চাইল রুমাকে। পারল না। গলায় কোনও শব্দ নেই।

অগত্যা আর একবার রিস্টওয়াচে সময় দেখল। দশটা পঁয়ত্রিশ। তাই হওয়া উচিত। সে তো বাজার থেকেই ফিরেছে সাড়ে ন'টা নাগাদ। তারপর এতগুলো কাজ সেরেছে। রিস্টওয়াচে কোনও ভুল নেই। এখন দশটা পঁয়ত্রিশই। কিন্তু দেওয়ালে ঝোলানো হার্ডিঞ্জ সাহেবের ঘড়ি বলছে এখন ন'টা দশ।

মৃদুলের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়িটা। টিকটিক শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। পেন্ডুলামও স্থির। মৃদুলের ভয় সেখানেই। ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মানে পরিবারে কারও না কারও মৃত্যু।

প্রথম বন্ধ হয়েছিল বছর দশেক আগে। সেবার মৃদুলের মা মারা যান। রেণুকার এমনিতে কোনও অসুখবিসুখ ছিল না। কিন্তু ঘড়ি বন্ধ হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। প্রায় বেহুঁশ অবস্থা। তিনদিন পর সব শেষ। রেণুকা মারা যাবার চার বছর পর আবার বন্ধ হলো ঘড়ি। মৃদুলের বাবা প্রিয়তোষ ছেলের মুখে খবরটা শুনে অদ্ভুতভাবে হেসেছিলেন। সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন নিয়তির নির্দেশ। সেদিন দুপুরেই তার স্ট্রোক হলো। ডাক্তার ডাকারও সময় পাওয়া গেল না। ঘড়িটা শেষ বন্ধ হয়েছে আট মাস আগে। সেই ধাক্কায় চলে গেছেন মৃদুলের ছোট পিসিমা। কীভাবে যেন হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যান। মাথায় চোট লাগে। মস্তিষ্কে মাত্রাতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তার মৃত্যু হয়।

সত্যিই অদ্ভুত ঘড়িটা। দেখতে যেমন সুন্দর স্বভাবে তেমনই ভয়ঙ্কর। দেড়শো বছর বয়েস। অথচ দেখলে মনে হবে নতুন। দুধ সাদা ডায়ালে সময় একটা সামান্য আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারেনি। রোমান হরফে লেখা সংখ্যাগুলো আজও ঝকঝক করে। মৃদুল বুঝতে পারে না কী করে এমন হয়! তার জন্মের আগে থেকে ঘড়িটা বাড়িতে আছে। অথচ কোনওদিন মিস্ত্রি ডাকতে হয়নি। নিজের খেয়ালে ঘড়িটা বন্ধ হয়। আবার নিজের খেয়ালেই চলতে শুরু করে। বন্ধ থাকার সময়টুকুতে ছিনিয়ে নিয়ে যায় কোনও না কোনও জীবন।

শিউরে উঠল মৃদুল। একটা প্রশ্ন মাথার ভেতর হাতুড়ির মতো আঘাত করছে। এবার তাহলে কে? মৃদুল? রুমা? নাকি বেঙ্গালুরুতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাওয়া তাদের একমাত্র মেয়ে বাবুই?

রুমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখল মৃদুল পাথরের মতো বসে আছে। দৃষ্টি দেওয়ালের ওপর স্থির। কী হয়েছে বুঝতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না। বিয়ের পর থেকে সে এই অভিশপ্ত ঘড়ির কথা শুনে আসছে। প্রিয়তোষ বলতেন, 'শখ করে পাপ ঘরে এনেছি। ফল আমাকে ভুগতেই হবে। দুঃখ হয় তোমাদের কথা ভেবে।'

'আজ ঘড়িতে দম দিয়েছিলে?' আচমকাই রুমার মুখ থেকে প্রশ্নটা ছিটকে বেরোল।

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল মৃদুল। এ কাজে তার ভুল হয় না। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই সে ঘড়িতে দম দেয়। কতবার সকাল হয়ে গেছে মনে করে মাঝরাতেই মৃদুল ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। কতবার অফিস থেকে ফোন করে জানতে চেয়েছে, 'দ্যাখো তো রুমা, ঘড়িটা চলছে কিনা?' ওই ঘড়িতে দম দিতে ভুলে যাওয়ার কথা মৃদুল ভাবতেই পারে না।

চায়ের কাপ কোনওরকমে টেবিলে নামিয়ে নিদারুণ আতঙ্কে রুমা বলল, 'শীগরির বাবুইকে ফোন করো। ওকে বলে দাও ভুলেও যেন হোস্টেলের বাইরে না যায়।'

ফেব্রুয়ারির শেষে বেঙ্গালুরুর আবহাওয়া এখন মনোরম। বাবুই বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে গিয়েছিল। তারস্বরে মাইক বাজছে। মৃদুল চিৎকার করে বলল, 'তুই এখনই হোস্টেলে ফিরে যা বাবুই। ক'টা দিন বাইরে কোথাও যাবি না। কলেজেও নয়।'

বাবুই অবাক, 'বাইরে যাব না মানে! কী হয়েছে সেটা বলবে তো?'

'ঘড়িটা আবার বন্ধ হয়ে গেছে।'

'রিল্যাক্স বাবা। দাদু-দিদুনের ডেথের সঙ্গে ঘড়ি বন্ধ হবার কোনও সম্পর্ক নেই। ওটা একটা কোইনসিডেন্স।'

শব্দটা মৃদুলের কাছে নতুন নয়। কোইনসিডেন্স। সমাপতন। রেণুকার মৃত্যুর পরে সে-ও সমাপতনের যুক্তি সাজিয়ে প্রিয়তোষের সঙ্গে তর্ক করেছে। বয়েস কম হলে করা যায়। কিন্তু বাহান্ন বছরের মৃদুলের সেই সাহস নেই। তাছাড়া শুধু তো ভবানীপুরের প্রিয়তোষ হালদার নন। পৃথিবীর কত যে মানুষ ওই সুদৃশ্য ঘড়িটা নিজের করে তুলতে গিয়ে চরম মূল্য দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। ইতিহাস কখনও মিথ্যে হতে পারে না। রীতিমতো অসহিষ্ণু হয়ে উঠল মৃদুল, 'আঃ বাবুই বাজে তর্ক করিস না। যা বলছি শোন। নয়তো তোকে নিয়ে টেনশন করেই আমি শেষ হয়ে যাব।'

'কিন্তু বাবা দু'মাস পর কলেজের সেমিস্টার। এই সময় কলেজে না গেলে আমার কতটা ক্ষতি হবে বুঝতে পারছ?'

মৃদুল কোনও কথা শুনতে রাজি নয়, 'হোক ক্ষতি। তোর ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার থেকে বেঁচে থাকাটা আমার কাছে বেশি জরুরি।'

হাতে সময় বেশি নেই। অনেকগুলো ফোন করতে হবে। মৃদুল রুমার বাবা-মাকে দিয়ে শুরু করল।

অশোক বললেন, 'আমার তো তোমাদের জন্য চিন্তা হচ্ছে। বাবুইকে এখন কিছুদিন কলকাতায় এনে রাখলে হয় না?'

'না বাবা। দূরে থাকাই ভালো। এখানে বিপদ বেশি।'

হার্ডিঞ্জ সাহেবের অভিশপ্ত ঘড়ির কথা আত্মীয় স্বজনরা সকলেই জানে। শ্যামবাজারে খুড়তুতো ভাই, হাওড়ায় ছোটমাসি, দিল্লিতে বড়দিভাই— সবাইকে সাবধান করে দিল মৃদুল। এর বেশি তার এই মুহূর্তে আর কিছু করার নেই। এরপর শুরু হবে অন্তহীন অপেক্ষা। যার কথা ভাবলেই ভয়ে মৃদুলের বুক কেঁপে ওঠে।

রুমা বলল, 'ঘড়িটা কোথাও ফেলে দিয়ে এলে হয় না?'

মৃদুল ঘাড় নাড়ল, 'তাতে কোনও লাভ নেই রুমা। ঘড়িটা যদি কেউ কিনে নিয়ে যায় তবেই আমরা মুক্তি পাব। কে কিনবে বলো? সব জেনেশুনে আমরাই কি পারব কাউকে কিছু বলতে?'

রুমা কিছু বলল না। ঘড়ির ইতিহাস সে জানে। প্রিয়তোষ নিজে তাকে বলেছেন।

ঘড়িটা তৈরি করেছিলেন সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত ক্লকমেকার এডওয়ার্ড বার্নার। আঠারোশো সাতষট্টি সালে। বহু হাত ঘুরে এবং বহু জীবন নষ্ট করে ঘড়িটা ঊনিশশো পঞ্চাশ সালে কলকাতায় পৌঁছয়। ডব্লুউ. এইচ. হার্ডিঞ্জ কার কাছ থেকে ঘড়িটা কিনেছিলেন আজ আর তা জানার উপায় নেই। ভারত তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে। ব্রিটিশ সাহেবরা বেশিরভাগই ইংলন্ডে ফিরে যাচ্ছে। হার্ডিঞ্জ সাহেব ছিলেন একটু অন্যরকম। ভারতকেই তার নিজের দেশ বলে মনে করতেন। কলকাতা ছিল তার প্রিয় শহর। খিদিরপুরে থাকতেন। সেখানেই থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘড়িটা কেনার পর দশ বছরে তাঁর স্ত্রী, তিন ছেলেমেয়ে, ভাই এবং ভাইঝি মারা গেলেন। প্রতিটি মৃত্যুর ক্ষেত্রে ঘড়িটা হয় কিছুক্ষণ নয়তো কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মন ভেঙে গেল হার্ডিঞ্জ সাহেবের। তিনি ইংলন্ডে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যাবার আগে ঘড়িটা দিয়ে গেলেন রাধাবাজারের মিত্র ওয়াচ কোম্পানির মালিক নন্দলাল মিত্রকে।

এই গল্প প্রিয়তোষ শুনেছেন খোদ নন্দলালের মুখে। সেটা ঊনিশশো বাষট্টি সাল। প্রিয়তোষ তখন ডাকাবুকো যুবক। টাকাপয়সার তেমন অভাব নেই। পৈতৃক সম্পত্তি কিছু আছে। ভালো চাকরিও করেন। অ্যান্টিক জিনিস কেনার শখ তাকে পেয়ে বসেছিল। কলকাতার পুরনো

জিনিসের বাজারগুলোতে ঘুরতেন। সেই সূত্রেই আলাপ নন্দলালের সঙ্গে।

প্রিয়তোষের শখের কথা শুনে একদিন নন্দলাল দেখালেন ঘড়িটা। পছন্দ হলো প্রিয়তোষের। নন্দলাল বললেন, 'পছন্দ যখন হয়েছে নিয়ে যান। দাম দিতে হবে না। আমিও ঘড়িটা দাম দিয়ে কিনিনি।' প্রিয়তোষ অবাক। এমন সৃষ্টিছাড়া কথা তিনি জীবনে শোনেননি। সুতরাং রাজি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তখন নন্দলাল ঘড়ির ইতিহাস বলে বললেন, 'দাম দিলে মালিকানা জন্মায়। তাতেই ক্ষতি। এমনি যদি নিয়ে যান ওই ঘড়ি আপনার কোনও ক্ষতি করবে না। আমার কাছে তো দু'বছর আছে। আমার তো কোনও ক্ষতি হয়নি।' প্রিয়তোষ সেকথা শোনেননি। অভিশাপ-টভিশাপ তার কুসংস্কার বলে মনে হয়েছিল। নন্দলালের হাতে জোর করে দু'শো টাকা গুঁজে দিয়ে ঘড়িটা বাড়িতে এনেছিলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রুমা। রেণুকার মৃত্যুর পর কতবার যে প্রিয়তোষ তার অল্পবয়েসের একটা ভুলের জন্য আপশোস করেছেন গুনে শেষ করা যাবে না। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

একটা করে দিন কাটে আর পাহাড়প্রমাণ এক আতঙ্ক বুকের ওপর চেপে বসে। এখনও পর্যন্ত কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে সরিসৃপের মতো বুকে হেঁটে এগিয়ে আসতে পারে মৃত্যু। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে মৃদুল আর রুমা। যেন তাদেরই সব দায়। তারাই প্রিয়তোষের দুর্ভাগ্যের অধিকারী। যতদিন ঘড়ি বাঁচতে দেবে ততদিন তাদের বয়ে বেড়াতে হবে এই উত্তরাধিকার।

বাবুইকে নিয়ে রুমার মনে সামান্য সংশয় ছিল। হয়তো কথা শুনবে না। হাজার হোক চোখে চোখে রাখার মতো তো কেউ নেই। কিন্তু না, বাবুই অবাধ্য হয়নি। বাবা-মা কষ্ট পায় এমন কোনও কাজ সে করে না। সাতদিন সে কলেজে যায়নি। পারলে রুমা আরও সাতদিন মেয়েকে বন্দি করে রাখত। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়।

রুমার ভয় মৃদুলকে নিয়ে। মৃদুলের হাই ব্লাড প্রেশার। সুগারও আছে। এই ক'দিনে যা চেহারা হয়েছে মৃদুলের, দেখলে মায়া হয়। একদিন তো প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা নিয়ে অফিস থেকে ফিরল। ঘাবড়ে গিয়েছিল রুমা। স্ট্রোক-ফোক হবে না তো? ভাগ্য ভালো সেসব কিছু হয়নি।

আজ রবিবার। ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রথম ছুটির দিন। রুমা বলল, 'নন্দলালবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করো না। যদি উনি কোনও রাস্তা বলতে পারেন।'

'নন্দলালবাবুর তো তখনই চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়েস। এখন কি আর তিনি বেঁচে আছেন।'

'উনি না থাকুন, ওর বাড়িতে তো কেউ থাকবেন। তারা যদি বলতে পারেন। আমাদের হাতে তো কিছু নেই, একটা চেষ্টা করা আর কী।'

'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু ঠিকানা পাব কোথায়?'

রুমা আগে থেকেই সব ভেবে রেখেছে, 'বাবার একটা ফাইল আমি দেখেছি। ওপরে লেখা হার্ডিঞ্জ সাহেবের ঘড়ি। ভেতরে কী আছে অবশ্য আমি জানি না।'

ফাইলটা পাওয়া গেল। প্রিয়তোষ গোছানো স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ঘড়ি কেনার রসিদ এবং অন্যান্য কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে গেছেন। রসিদে নন্দলালের দোকান এবং বাড়ির ঠিকানা রয়েছে। ফোন নম্বরও। কিন্তু বাষট্টি সালের নম্বর পালটে যাওয়াই স্বাভাবিক। মৃদুল বাড়িতে যাওয়া মনস্থ করল। রবিবারে দোকান বন্ধ থাকতে পারে।

বেরোবার সময় রুমা বলল, 'এখন তো তিনটে বাজে। কখন ফোন করব তোমায়?'

মৃদুলের মনে হলো ছটফট করছে রুমা। আশা করছে ভালো কিছু ঘটবে। এবং সে ক্রমশ ছোট হয়ে আসা একটা বৃত্ত থেকে নিজের হাতে গড়া সংসারটাকে নিরাপদে বের করে নিয়ে যেতে পারবে। দীর্ঘশ্বাস আড়াল করল মৃদুল। সে জানে রুমার জন্যই সংসারটা আজও টিকে আছে। অন্য কেউ হলে এই পরিবেশে থাকতে পারত না। কত কী সহ্য করেছে রুমা। তবুও কখনও প্রিয়তোষের দিকে আঙুল তোলেনি। যেন প্রিয়তোষ তার শ্বশুর নন, বাবা। সেও প্রিয়তোষের পুত্রবধূ নয়, মেয়ে। মেয়ে যেমন বাবার ভুল ক্ষমা করে কাছে টেনে নিতে পারে সে তেমন করেই আপন করে নিয়েছে প্রিয়তোষকে।

'তোমাকে ফোন করতে হবে না। কোনও রাস্তা খুঁজে পেলে আমিই তোমায় করব।'

হাওড়ায় মৃদুলের ছোটমাসির বাড়ি। ছেলেবেলায় প্রায়ই আসত। রসিদে ছাপা ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে নিয়েছে সে। একুশের দুই পঞ্চাননতলা রোড। জায়গাটা কাছেই। হাওড়া ময়দান থেকে ডাইনে ঘুরে কিছুদূর যাওয়ার পর বাঁদিকে একটা রাস্তা পড়ে। সেটাই পঞ্চাননতলা রোড। একুশের দুই নম্বর বাড়িটা অবশ্য বাসরাস্তার ওপর নয়। একটা সরু গলির ভেতর।

মোড়ের মাথার পানের দোকানে জিজ্ঞাসা করে মৃদুল একটা সেকেলে ধরনের দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। এটাই একুশের দুই। দরজায় কলিংবেল নেই। জোরে জোরে কড়া নাড়ল মৃদুল। দরজা খুললেন এক বৃদ্ধ। পরনে লুঙ্গি আর ফতুয়া। বৃদ্ধের ভাঙাচোরা চেহারার আনাচেকানাচে আভিজাত্যের আলগা কিছু চিহ্ন এখনও রয়ে গেছে।

মৃদুল বলল, 'নন্দলাল মিত্র বলে এ বাড়িতে কি কেউ থাকেন?'

'হ্যাঁ এটা তারই বাড়ি। কিন্তু তিনি তো দশ বছর হলো মারা গেছেন।'

'ওঁর ছেলে-টেলে কেউ নেই? মানে, আমার খুব জরুরি দরকার। ওঁর ছেলেকে পেলেও আমার চলবে।'

'আমিই ওঁর ছেলে। বংশীলাল মিত্র।'

'নমস্কার। আমার নাম মৃদুল হালদার। ভবানীপুর থেকে আসছি!'

'ভেতরে আসুন।'

বংশীলালের বোধহয় বাগানের শখ। ভেতরের উঠোনে সারি সারি টবে নানা রকমের ফুলের গাছ। শেষ বিকেলের মৃদু আলোয় ভরন্ত গোলাপ আর চন্দ্রমল্লিকার বাহারে উঠোনটা ঝলমল করছে।

পেল্লাই সাইজের একটা ঘরে ঢুকে বংশীলাল বললেন, 'বসুন।'

ঘরে তক্তপোষ ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। মৃদুল সেখানেই বসল। বংশীলাল বললেন, 'বলুন আপনার কী দরকার।'

মৃদুল আগাগোড়া সব খুলে বলল। বংশীলাল মন দিয়ে শুনে বললেন, 'আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল মারাত্মক কোনও বিপদে পড়ে ছুটে এসেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি তো আপনাকে কোনও সাহায্যই করতে পারব না। বাবা ঘড়ির ওস্তাদ কারিগর ছিলেন। আমি ও লাইনের লোক নই। মারা যাবার বছর পাঁচেক আগে তাই দোকান বিক্রি করে দিয়েছিলেন।'

মৃদুল ভেবেছিল নন্দলালবাবুর ছেলে থাকলে তিনিও নিশ্চয়ই ঘড়ির ব্যবসাই করবেন। এভাবে ভাবা তার ঠিক হয়নি। বোঝা উচিত ছিল বাঙালির ব্যবসা এক পুরুষের বেশি টেকে না। হতাশা গোপন করতে পারল না সে, 'তাহলে আর কী হবে! মিছিমিছি আপনার খানিকটা সময় নষ্ট করলাম।'

বংশীলাল কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'জানি না আপনার কোনও উপাকার হবে কি না, তবে মারা যাবার আগের কয়েক মাস বাবা ডায়েরিতে কীসব হিজিবিজি লিখতেন। আমি অবশ্য কোনওদিন সে ডায়েরি উল্টে দেখিনি। যেখানে যদি ওই ঘড়ি সম্বন্ধে কিছু লিখে গিয়ে থাকেন...'

'ডায়েরিটা আমি একবার দেখতে পারি?'

'পুরনো জিনিস তো, খুঁজতে একটু সময় লাগবে। আপনি বরং ফোন নম্বরটা দিয়ে যান। পেলেই আমি আপনাকে জানিয়ে দেব।'

ফোন নম্বর লিখে দিয়ে মৃদুল বেরিয়ে পড়ল। তার মন ভালো নেই। অন্তহীন সংশয়ে সে ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে। বয়েস হলে মানুষের মাথায় নানারকম বাতিক চাপে। হয়তো সেই কারণেই নন্দলালবাবু ডায়েরি লিখতেন। ওই ডায়েরি পাওয়া গেলেও আদৌ কোনও লাভ হবে না।

রুমা ভালো খবরের আশায় অপেক্ষা করছিল। মৃদুল বাড়ি ফেরা মাত্র জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু পেলে?'

মৃদুল কিছু গোপন করল না। সে রুমাকে অন্ধকারে রাখতে চায় না। যে-পরিণতি ক্রমশ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। বংশীলালের বৃত্তান্ত শেষ করে মৃদুল বলল, 'আর কোনও আশা নেই রুমা। ওই ঘড়ির জন্য হার্ডিঞ্জ সাহেব নির্বংশ হয়েছিলেন। প্রিয়তোষ হালদারকেও হতে হবে।'

কান্না গোপন করে রুমা বলল, 'প্লিজ ভেঙে পড়ো না। দেখবে ডায়েরিতে কিছু একটা থাকবে।'

নিস্তব্ধ বাড়ি। আলোগুলো শেয়ালের চোখের মতো জ্বলছে। সুখ-দুঃখের জীবন্ত পৃথিবী থেকে নির্বাসিত দুটি মানুষ সেই আলোর দিকে অন্ধের মতো তাকিয়ে রয়েছে। কেউ কোনও কথা বলছে না। যেন সব কথা ফুরিয়ে গেছে।

মৃদুলের খিদে নেই, খাবে না। রুমাও খেল না। সব খাবার ফ্রিজে রেখে মৃদুলের পাশে এসে বসল। কী যেন তার বলার ইচ্ছে। কিন্তু সে, কিছু বলার আগেই ফোনটা বাজল। অচেনা নম্বর। মৃদুল বিরক্ত। রুমা বলল, 'ফোনটা ধরো।'

মৃদুল সাড়া দিতেই ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল বংশীলালের গলা, 'ডায়েরিটা পেয়েছি ভাই। আপনার ওই ঘড়ি নিয়ে বাবা কয়েকটা কথা লিখে রেখে গেছেন।'

অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ গলায় মৃদুল বলল, 'কী কথা বংশীবাবু।'

'বলছি। তার আগে বলুন ঘড়িটা কবে বন্ধ হয়েছে?'

'১৮ই ফেব্রুয়ারি।'

'ব্যাস ঠিক আছে। এবার পড়ছি শুনুন। বাবা লিখেছেন, হার্ডিঞ্জ সাহেব বলেছিলেন ঘড়িটার জন্ম ১৮৬৭ সালে। এর ঠিক দেড়শো বছর পর ঘড়িটা আত্মহত্যা করবে। তারপর আর চলবেও না, কোনও ক্ষতিও করতে পারবে না।'

মৃদুলের মনে একটা ক্ষীণ আশা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বংশীলালের কথায় সে চুপসে গিয়ে বলল, 'ঘড়ির আত্মহত্যা! এসব আপনি কী আবোলতাবোল কথা বলছেন?'

'পুরোটা আগে শুনুন, তারপর কথা বলবেন। বাবা লিখেছেন, কথাটা আমার বিশ্বাস হয়নি। জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঘড়ি যে আত্মহত্যা করেছে সেটা প্রমাণ হবে কী করে? হার্ডিঞ্জ সাহেব বলেছিলেন পেন্ডুলামের ঢাকনা খুললে পেন্ডুলামটা আপনা থেকেই খুলে নীচে পড়ে যাবে।'

'তা হার্ডিঞ্জ সাহেব এত কথা জানলেন কী করে?'

'ইচ্ছাশক্তির জোরে। জানি বিশ্বাস করবেন না, তবুও শুনুন। সাহেব রোজ ঘড়ির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতেন। দু'বছর কোনও ফল হয়নি। তারপর একদিন ঘড়ি নিজেই জানিয়েছিল তার অপঘাত মৃত্যুর কথা। আত্মহত্যার কথা।'

ফোন রেখে মৃদুল বলল, 'বুড়োর ভিমরতি ধরেছিল। না হলে কেউ এসব কথা লেখে!'

স্পিকার অন করা ছিল। রুমা সবই শুনেছে। নন্দলালবাবুর কথা মৃদুল বিশ্বাস না করলেও রুমা করেছে। সে ভাবছিল ঘড়িটার জীবন যদি অলৌকিক হতে পারে তাহলে মৃত্যুই বা হবে না কেন! তাই সে মৃদুলকে বলল, 'কী হলো, ঢাকনাটা খুলবে না?'

'সব বুজরুকি রুমা। কেন মিছিমিছি ওসব নিয়ে ভাবছ!'

'আমি বলছি ভালো কিছু হবে। যাও একবার।'

পুতুলের মতো উঠে দাঁড়াল মৃদুল। তার নিজের কোনও বিশ্বাস নেই। রুমার বিশ্বাস তাকে ঠেলে নিয়ে গেল। চেয়ারে উঠে সে টের পেল তার শরীর থরথর করে কাঁপছে। কাঁপা হাতেই সে খুলে ফেলল পেন্ডুলামের ঢাকনা। তারপর অপেক্ষা। অন্তহীন অপেক্ষা। দশ মিনিট কেটে গেল। মৃদুল অধৈর্য হয়ে কিছু একটা বলতে যাবে ঠিক সেই সময় ঠং করে একটা শব্দ।

মৃদুল আর রুমা বিস্ফারিত চোখে দেখল আংটা থেকে খসে পড়েছে পেন্ডুলাম। শুধু পড়েইনি, ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশী সংগীত

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশকে কী চোখে দেখতেন তা ১৩০৯-এর ২৭ কার্তিক কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত একটি পত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের স্বদেশ সম্বন্ধে কোন আদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ করতে চান সেই অভিপ্রায় পত্রটিতে ব্যক্ত করেছেন : "ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তি-শ্রদ্ধাবান করিতে চাই।... স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্ত অবজ্ঞা উপহাস ঘৃণা— এমনকী অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই।... অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।" এমন এক কবি যে দীর্ঘজীবন ধরে অজস্র স্বদেশী-সংগীত রচনা করবেন তাতে সংশয় কোথায়?

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে রচিত স্বদেশী সংগীতগুলির মধ্যে অন্যতম ১২৮৪ বঙ্গাব্দে রচিত 'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ।' ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বন্দে মাতরম্' সংগীতে দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অতুলপ্রসাদ সেন ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অজস্র স্বদেশী সংগীতের রচয়িতা হলেও সাধারণত সেসব সংগীতে দেশকে মাতৃরূপে সম্বোধন করেননি (ব্যতিক্রম দ্বিজেন্দ্রলালের, 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ')। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন। এই মাতৃসম্বোধন যে কবির অন্তর থেকে উৎসারিত তা সংগীতটি শুনলেই বোঝা যায়। মনে রাখতে হবে, গানটি পনেরো বছরের কিশোর কবির রচনা :

'তোমারি তরে, মা সঁপিনু এ দেহ,
তোমারি তরে, মা, সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।।

'সঞ্জীবনী সভা'র অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ সংগীতটি রচনা করেন। জাতীয় উন্নতিকর কাজ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে আনুমানিক ১২৮৩ বঙ্গাব্দে (১৮৭৭) এই গুপ্তসভাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু তার সভাপতি ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ব্রজনাথ দে প্রমুখ তার সভ্য ছিলেন। ঠন্ঠনের একটি গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে এই সভা বসত। এই সভারই অনুরোধে কবি আরও কয়েকটি স্বদেশী সংগীত রচনা করেন। এগুলির মধ্যে অন্যতম :

"অয়ি বিষাদিনী বীণা, আয় সখী, গা লো সেই-সব পুরানো গান—
বহুদিনকার লুকানো স্বপনে ভরিয়া দে-না লো আঁধার প্রাণ।।
হা রে হতবিবি, মনে পড়ে তোর সেই একদিন ছিল
আমি আর্যলক্ষ্মী এই হিমালয়ে এই বিনোদিনী বীণা করে লয়ে
যে গান গেয়েছি সে গান শুনিয়া জগত চমকি উঠিয়াছিল।।
আমি অর্জুনেরে—আমি যুধিষ্ঠিরে করিয়াছি স্তনদান।
এই কোলে বসি বাল্মীকি করেছে পুণ্য রামায়ণ গান।।..."

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে নজরুল ইসলামও তাঁর গানে, কবিতায় রামায়ণ-মহাভারতের প্রসঙ্গ নিয়ে আসতেন।

এই দুটি ব্যতীত এসময় রবীন্দ্রনাথ রচিত আরেকটি স্বদেশী সংগীত :

"ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি
যতদিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি
ততদিন তুই কাঁদ রে।"

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ অজস্র স্বদেশী সংগীত রচনা করেন। এগুলির মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে গাওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত, কয়েকটি বঙ্গমাতার সৌন্দর্যবর্ণনা। কয়েকটি দেশবন্দনা, তবে অধিকাংশই তেজোময় সংগীত যা আজও জীবন-সংগ্রামে রত মানুষের জীবনের মন্ত্র হয়ে ওঠে।

১২৯৩ সালে (১৮৮৬) কলকাতার প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে উদ্‌বোধন সংগীত রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। গানটি তিনি স্বয়ং সভায় গেয়েছিলেন— ''আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে/ ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে।'' গানটি তিনি রামপ্রসাদী সুরে গেয়েছিলেন। পঁচিশ বছরের কবি জানতেন, সর্বসাধারণের জন্য রচিত গানের সুর সাধারণের পরিচিত সুর হওয়া আবশ্যক। গানটি শুনলে বোঝা যায় সময়োপযোগী সংগীত রচনায় কী অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

এর কয়েকমাস পরে অধ্যাপক প্রসন্নকুমার রায়ের অনুরোধে কলকাতা কলেজের ছাত্রদের মিলনসভার জন্য নিম্নলিখিত গানটি রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ :

''তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ।
পলে পলে মরি সেও ভালো, সহি পদে পদে অপমান।।''

এই সময়ে রচিত আরও দুটি গানের সঙ্গে এই গানটির ভাবের সাদৃশ্য রয়েছে। গানদুটি হলো— ''কেন চেয়ে আছো গো মা মুখপানে'' এবং ''আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।'' শেষোক্ত গানটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনেক বছর পরে লিখেছেন, ''একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে সে বহুদিন পূর্বের কথা। তখনকার দিনে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের অঙ্গুলি তোলা ছিল রাজপ্রসাদকণা বর্ষণের প্রত্যাশায়। একদা কোনো জায়গায় তাঁদের কয়েকজনের সান্ধ্য বৈঠক বসবার কথা ছিল। তাঁদের দূত ছিলেন আমার পরিচিত এক ব্যক্তি।... যেতে হলো। ঠিক যাবার পূর্বক্ষণেই আমি নিম্নোদ্ধৃত গানটি রচনা করেছিলাম— 'আমায় বোলো না গাহিতে' ইত্যাদি। এই গান গাওয়ার পর আসর জমল না। সভাস্থগণ খুশি হননি।'' কৃষকের জীবনের শরিক যে জন নয়, কথায় ও কার্যে তার সঙ্গে আত্মীয়তা যে অর্জন করেনি, সে কবির কৃষকের জন্য নকল ক্রন্দন রবীন্দ্রনাথ সহ্য করেনি। তেমনই তাঁর কাছে অসহনীয় ছিল স্বদেশকে ভালো না বেসেও সভা ও সমিতিতে স্বদেশ-প্রেম প্রকাশের মিথ্যে ছলনা।

কয়েকটি গানে কবি বঙ্গজননীর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। যেমন 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি'। লক্ষণীয়, এ গানে বঙ্গদেশে প্রস্ফুটিত ফুল, ফল বা বাংলার পরিচিত পাখির নাম নেই। কবি কল্পনায় বঙ্গজননীর মানস প্রতিমা রচনা করেছেন :

''ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।।''

এই পর্যায়ের আর একটি গান, ''আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি''। কৈশোরে রচিত স্বদেশী সংগীতগুলির মতো বিষণ্ণতার সুর এই গানগুলিতে অনুপস্থিত। কারণ ইতিমধ্যে কবির দেহে-মনে যৌবন আবির্ভূত হয়েছে। যৌবন— জীবনের সেই আশ্চর্য সময়কাল যখন প্রকৃতি চোখে এমন অপরূপ মায়াকাজল পরিয়ে দেয় যে সবই সুন্দর লাগে। রবীন্দ্রনাথেরও লেগেছিল। আর রবীন্দ্রনাথের মনে যে যৌবন অনেকদিন স্থায়ী হয়েছিল এ সত্য সর্বজনবিদিত। তাই চুয়াল্লিশ বছরের যুবক কবি লিখেছেন :

''ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ওমা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।।

রবীন্দ্রনাথ 'সৃষ্টি' প্রবন্ধে বলেছেন, 'নীলাকাশের ইশারা আমাদের প্রতিদিন বলেছে, ''আনন্দধামের মাঝখানে তোমাদের প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ।''... সন্ধ্যামেঘে অস্তসূর্যচ্ছটায় সে দূত আবার বললে, 'নিমন্ত্রণ আছে। ...আমি সত্য, তাই আমার জন্যে সমস্ত আকাশের রঙ নীল করে, সমস্ত পৃথিবীর আঁচল শ্যামল করে, সমস্ত নক্ষত্রের অক্ষর উজ্জ্বল করে আহ্বানের বাণী মুখরিত। এই নিমন্ত্রণের উত্তর দিতে হবে না কি। সে উত্তর ওই আনন্দধামের বাণীতেই যদি না লিখি তা হলে কি গ্রাহ্য হবে। মানুষ তাই মধুর করেই বললে, ''আমার হৃদয়ের তারে তোমার নিমন্ত্রণ বাজল। রূপে বাজল, ভাবনায় বাজল, কর্মে বাজল; হে চিরসুন্দর, আমি স্বীকার করে নিলেম। আমিও তেমনি সুন্দর ক'রে তোমাকে চিঠি পাঠাব, যেমন ক'রে তুমি পাঠালে।'' রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি সেই আমন্ত্রণপত্রের অপরূপ সুন্দর উত্তর।

'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গানটিও স্বদেশমাতার স্তব হিসেবে সুপরিচিত।

'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' গানটির ভাবের অনন্যতা, ভাষার সৌন্দর্য ও শব্দপ্রয়োগে দক্ষতা দেখে বিস্ময় জাগে। দীর্ঘ গানটির প্রথম স্তবকটি আমাদের জাতীয় সংগীত রূপে গীত হয়। সম্পূর্ণ গানটিই অনবদ্য :

''...পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।...''

গানটি কবে, কোথায় রচিত তা জানা যায় না। গানটিকে ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপনের সময় অনেকে প্রচার করেন, গানটি সম্রাট পঞ্চম জর্জের কলকাতা আগমনকে কেন্দ্র করে রচিত। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র পুলিনবিহারী সেন গানটি রচনার উপলক্ষ্য জানতে চেয়ে কবিকে পত্র লিখলে তিনি ২০ নভেম্বর ১৯৩৭-এ লেখেন, ''সে বৎসর ভারতসম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন-অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণা করেছি, পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথী, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন

না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেন না ভক্তি যতই প্রবল থাক বুদ্ধির অভাব ছিল না।''

স্বাধীন ভারত গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিয়ে নানা অপপ্রচারের যোগ্য জবাব দিয়েছে।

অনেকগুলি গানে কবি দেশমাতাকে বন্দনা করেছেন, যেমন 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে', 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' কবির ঐকান্তিক স্বদেশপ্রেম সংগীতগুলির মধ্যে পরিস্ফুট। সেই সঙ্গে রচয়িতা যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ভাষার সৌন্দর্যেও গানগুলি অনুপম।

সম্পূর্ণ অন্য ধরনের সংগীত 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী'' :

হতবল, নিশ্চল, কীর্তিহীন, আনন্দহীন, অবসাদগ্রস্ত জনগণকে প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ করে তোলার প্রার্থনা করেছেন কবি ঈশ্বরের কাছে এই সংগীতে।

আরেকটি সুপরিচিত স্বদেশী গান ''এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে 'জয় মা' বলে ভাসা তরী।'' গানটি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় রচিত। এই সময় কবি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় লেখেন, ''আগামী ৩০ আশ্বিন (১৩১২) বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালির রাখিবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব।'' এই দিনটি উপলক্ষে কবি রচনা করেন ''বাংলার মাটি বাংলার জল।''

রবীন্দ্রনাথের বহু সংগীত পরাধীন ভারতের বহু বিপ্লবীর ধ্যানের মন্ত্র ছিল। কবি সংগ্রামী মানবকে সঙ্কোচের বিহ্বলতা ত্যাগ করে নির্ভয় হয়ে নিজেকে জয় করার পরামর্শ দিয়েছেন। কোনো গানে বিপ্লবীর আহ্বানে যদি কেউ আগুয়ান না হয়, যদি তাঁর দুরূহ পথে যাত্রার কালে কেউ আলোকশিখা না ধরে, তবে উদ্দীপনার আগুনে নিজের হৃদয়কে জ্বালিয়ে নিয়ে একাকী পথ চলার পরামর্শ দিয়েছেন। আবার কখনো বা সম্মিলিত ভাবে সহস্র বাধার সামনে নির্ভীক চিত্তে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা দিয়েছেন :

''এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন—
বন্দে মাতরম্।।...

কোথাও বা সংগ্রামের পথে অগ্রসর হলে যে-সমস্ত বিঘ্ন আসতে পারে সে সম্পর্কে সতর্ক করেছেন :

''তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তাব'লে ভাবনা করা চলবে না।

এই পর্যায়ের একটি অপরূপ গান— 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার''— পরাজিতের পরাজয় যে শাশ্বত নয়, বন্দির বন্ধনডোর যে বারবার ছিঁড়ে যায়, ফুল-পল্লব নদীনির্ঝর যে তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে গান গেয়ে ওঠে, সেই পরম আশার বাণী কবি শুনিয়েছেন এই গানে। একদিন যে সব গান বিপ্লবীদের অতি প্রিয় ছিল, আজও তা সংগ্রামী মানুষকে প্রেরণা দেয়। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন, ''সে-সব গানের ঐতিহাসিক পটভূমি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও উহাদের রসধর্ম কখনো নষ্ট হয় না, কারণ বিশেষকে ছাপাইয়া উহার ভাবরাজি স্থানকাল- নির্বিশেষে চিরন্তনতা লাভ করিয়াছে।'' ■

পাড়াইজম

ভবেন্দু ভট্টাচার্য

বর্তমানে সমস্ত দেশটাকে যখন প্যারা byপ্যারা ভাগ করেও কোনো সমস্যারই সমাধান করা যাচ্ছে না, তখন গোটাটাকে একটা পাড়া ধরে নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য আমি প্রস্তাব করছি। এতে যে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাবে— পাড়ায় যাঁরা থাকেন (তা সে যে পাড়াতেই হোক) তাঁরাই স্বীকার করবেন।

আপনারা দেখেছেন কি না জানি না— কিন্তু আমি দেখেছি; যার বাইশ ইঞ্চি বুক— সেও আজকাল বুক ফুলিয়ে বলে থাকে,— জানো, আমি কোন্ পাড়ার ছেলে? যেন সে পাড়ায় জন্মালেই ছেলেরা গভর্নর জেনারেল কিংবা মাননীয় চিফ জাস্টিস জাতীয় কিছু একটা হয়ে থাকে এবং হতেই হবে। এমন হামেশাই হচ্ছে। আর শুধু এ পাড়ায়ই নয়, এপাড়া ওপাড়া— সর্বপাড়ায় ও সর্বত্র। দেখেশুনে মনে হয়, দেশের জন্য দেশাত্মবোধ না থাকলেও— পাড়ার জন্যে পাড়াত্ববোধের কারো বিন্দুমাত্র অভাব নেই। তাই পাড়াতত্ত্বের থিওরীতে ফেলতে পারলে প্রবলেমটা অনেকখানি সহজ হয়ে আসবে বলেই মনে হয়। অবশ্য তার জন্যে ভাবতে হবে না আপনাকে, বৈশিষ্ট্য চিরদিনই বজায় থাকবে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভেঙে কোনো পাড়াই কোনোদিন একসঙ্গে একপাড়া হতে চাইবে না।

পাড়াতন্ত্রে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সবাই-ই স্বতন্ত্র এক একটি স্টেট-বিশেষ; সবাই স্ব-শাসিত এবং স্বেচ্ছাতন্ত্রের সমর্থক। এপাড়ার লবকেষ্ট যদি ওপাড়ায় গিয়ে একটি ন্যাক্কারজনক কাজ করে বসে, ওপাড়ার রামা-শ্যামা কারুই তাকে কিছু বলা চলবে না। তাহলে এপাড়ার লবকেষ্টর ওপাড়ার রামা-শ্যামকে যদি নাই পায়, তবে নির্দোষ যদুমধুকে ধরে ঠেঙিয়েও সেই অন্যায় হস্তক্ষেপের সঠিক প্রতিবিধান করে তবে ছাড়বে। এদিক দিয়ে পলিটিক্সে তারা পাকিস্তানী। একমাত্র নিজেদের চৌহদ্দি ছাড়া অপরের অস্তিত্ব তারা স্বীকার করতেই নারাজ।

এই পাড়াত্ববোধের সেনসেশান যে কতদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে তা আপনি সহজেই বুঝতে পারেন, যদি কেরাণী-মাস্টার-বেকার- বকাটে বা প্রফেশনাল পলিটিসিয়ান না হন। কিছু না-বোঝাই এঁদের কোয়ালিফিকেশন কিনা, এঁদের সঙ্গে তুলনা চলে কেবল মিনিস্টারদের। অবশ্য খবরের কাগজের সম্পাদক কিংবা ধোপার ভারবাহী গর্দভটি হলেও বলবার কিছু নেই। কেন না, কোনো কোনো কাগুজে সম্পাদক শাসনপরিষদে ঢুকে ইতিমধ্যেই নাকি মন্ত্রিত্বের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন শোনা যাচ্ছে। আর সেদিন তো কোনো কোনো ধোপার গাধারাও নাকি রাজধানীর পথ দিয়ে প্রশেসন বার করে এগিয়ে যাচ্ছিল পরিষদ-গৃহের দিকে। পথে অবশ্য পুলিশ তাদের লাঠি চার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কিন্তু না দিলে কি হতো বলুন তো? একেবারে ভিতরে ঢুকে গিয়ে আর সবার সঙ্গে মিলে গেলে, খুঁজে পেতে আলাদা করা কি সহজ হতো শেষ পর্যন্ত?

সার্বজনীন পুজোর প্রতিযোগিতার বাজারে এ পাড়ার প্রতিমার কেবল আঁচলটুকু সম্বল হলে, ওপাড়ার ঠাকুরের থাকে শুধু কাঁচুলী। এ পাড়ায় যখন হাওয়াই শাড়ীর চলন, তখন ওপাড়ায় সুরু হয় হাইড্রোজেন শাড়ী। পাড়াগত কৃষ্টি আর পাড়াত্বের পলিটিক্সকে কেন্দ্র করে, স্বাতন্ত্র্যবোধের ইমোশান অনুযায়ী এক একটি পাড়ার বুকে গড়ে উঠেছে এক একটি এক একটি আলাদা নেশান। এবং সেই এলাকার মতবাদ মাফিক নিজেদের ট্র্যাডিশান বজায় রাখবার জন্যে— যে কোনো পার্টিশানের গণ্ডী টেনে রাখতেই তৎপর। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে, পলিটিক্স-প্যাঁচালো সমাজ দর্শনে এটি আর একটি অভিনব অবদান। অতি আধুনিক এই পাড়াতত্ত্বের নবতম নাম দেওয়া যেতে পারে পাড়াইজম্। পাড়াইজম্ যে-কোনো চলতি 'ইজম্'গুলোর থেকে অনেক জোরালো সে প্রমাণেরও অভাব নেই।

তাছাড়া পাড়া তো শুধু পাড়া নয়, পাড়ার ভাল কথা হলো পল্লী। পল্লীকে ইংরেজিতে বলে village; শহর থেকে village এ go back করতে বলে মহাত্মারা একদা দেশোদ্ধারের সহজ রাস্তা বাতলে দিয়েছিলেন, তাকে সাংঘাতিক রূপে সার্থক করে সমস্ত শহরটাই এখন village এর লেজ হতে বসেছে। নিছক কলকাতা শহরে যে এতগুলো পল্লী আছে তা কে জানতো?

জানা যায় সার্বজনীন পুজো পার্বণগুলোর হিড়িক পড়লে। সবার পল্লী-প্রীতি যেন কিল্‌বিলিয়ে ওঠে একেবারে। তা সে ষষ্ঠী অথবা শীতলা—মাকালী কিংবা ঘণ্টাকর্ণ যে পুজোই হোক না কেন। আসলে পুজোটা কিছুই নয়, পাড়াত্বটাই সব। প্রতিবেশী এ অ-প্রতিবেশী সবাই হাতে একখানি বাঁকানো খাতা এবং মুখে মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ী সুলভ হাসি নিয়ে, দলে দলে হাজির হতে থাকেন বাড়ির দরজায়। জিজ্ঞাসা করলেই জবাব আসে—আমাদের ইয়ের পল্লী-বেকার বান্ধব সমিতির চাঁদাটা—

কিন্তু 'ইয়ের' পল্লীর আপনি যদি কেউ নাও হন, তাহলেও নিস্তার নেই জানবেন। একবার দিয়ে থাকলে—আর একবার। যদি জানান,—আপনাদের ওই 'ইয়ের' পল্লীর 'নির্বিকার সঙ্ঘ' তো চাঁদা নিয়ে গেছেন। গম্ভীরভাবে তাঁরা জানাবেন,—আমাদেরটা হলো— বেকার বান্ধব সমিতি। ওদের পুজো হয় বড় রাস্তার ওপর, আমাদের হয় বাই লেনে। ওরা আর আমরা—আরে ছোঃ!

বেকার বান্ধব সমিতি বা নির্বিকার সঙ্ঘের সহৃদয় সভ্যদের হাত থেকে কোনো মতেই কারো রেহাই নেই এবং একই চৌহদ্দির মধ্যে হলেও, নিজ নিজ এলাকায় তাঁরা পরস্পরকে সহ্য করতেও নারাজ।

এই হলো পাড়াইজমের আদি কথা।

(লেখক স্বস্তিকার প্রয়াত সম্পাদক)

ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত

বিহারীলাল ও সেই সময়

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর চেয়ে বছর তিন-চারেকের ছোট ছিলেন। হলে হবে কী, দু'জনের বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। তাঁর স্মৃতিচারণায় বিহারীলালের ছোটবেলার যে ছবিটা উঠে আসে, তার সঙ্গে পরবর্তী কালের অন্তর্মুখী, ভাবে-বিভোর কবিমানুষটির বিশেষ সামঞ্জস্য নেই। কিশোর বিহারীলাল ছিলেন দীর্ঘদেহী, সবল, তেজি। শরীরে ভয়ডর বলে কিছু ছিল না। বাঙালিসুলভ চরিত্র বা চলাফেরার চেনা ছবি থেকে অনেক দূরের এই কিশোর; বরং তিনি একটু দাঙ্গাবাজ ধরনেরই ছিলেন। কৃষ্ণকমল গল্পচ্ছলে জানিয়েছেন, একবার আহিরিটোলায় ছেলেপুলেদের মধ্যে খুব মারামারি লেগেছে। বিহারীলালও ওই মারামারির দলে। এরই মধ্যে একটা ছেলে উত্তেজনার বশে হাতের লাঠির মধ্যে লুকিয়ে রাখা গুপ্তি খুলে, মারলো এক কোপ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিহারীলালের মুখ, কিন্তু তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। সামনে ছিল এক বিহারি পুলিশ। রক্ত দেখে বিস্মিত হয়ে শুধোলো : কী হয়েছে বাবু, কে আপনাকে মারল? তেজি বিহারীলাল পুলিশে নালিশ করার পাত্র ছিলেন না। বললেন, ও কিছু নয়, চৌকাঠে কপাল ঠুকে গেছে। যে ছেলেটা বিহারীলালের মাথায় গুপ্তি চালিয়েছিল অত রক্ত দেখে সে ঘাবড়ে-টাবড়ে কাছেই দাঁড়িয়েছিল। যখন দেখল বিহারীলাল পুলিশে নালিশ করলেন না, উল্টে ঠাণ্ডা চোখে ঘুরে ঘুরে তার দিকেই তাকাচ্ছে, এক অজানা ভয়ে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তবে কি বিহারী তাকে খুন করার মতলব আঁটছেন? তখন সে সরে পড়ল বটে, কিন্তু পরদিনই এসে আহত বিহারীর হাতে-পায়ে ধরে বিবাদ মিটিয়ে নিল।

অথচ এই দুর্দান্ত কিশোর বিহারীলালই পরবর্তী কালে কবিতায় মগ্ন এক নিভৃত মানুষ। প্রথম দিকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে 'মুগ্ধবোধ' পড়া শুরু করেছিলেন। শেষে ইস্কুল-কলেজের বাঁধাবাঁধি নিয়মে দমবন্ধ হয়ে আসায় বাড়িতে পণ্ডিত রেখে নিজেই পড়তে শুরু করলেন 'মুগ্ধবোধ'। অল্প দিনের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণে এতটাই অধিকার জন্মাল যে, রঘুবংশম, কুমারসম্ভব, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত আর শকুন্তলা, কৃষ্ণকমলের সাহায্য নিয়ে পড়ে ফেললেন। ইংরেজি প্রথমটায় জানতেন না। কিন্তু মেধা আর ইচ্ছাশক্তি এত প্রবল ছিল যে কৃষ্ণকমলকে ধরে, তাঁর সাহায্য নিয়ে বায়রণের একটি বই, শেক্সপীয়রের ওথেলো, ম্যাকবেথ, কিংলিয়রের মতো খানকতক নাটকও আত্মস্থ করে ফেললেন। পাশাপাশি সেকালের বাংলা সাহিত্য তো ছিলই। ছিল রামায়ণ, মহাভারত, ঈশ্বরগুপ্ত, দাশু রায়ের পাঁচালি।

কেন, কীসের আশায় নিজেকে তিলে তিলে এভাবে প্রস্তুত করছিলেন বিহারীলাল? নিশ্চয়ই এ-কারণে নয় যে, সমকালীন বিদ্বৎসমাজে যে-ধরনের লেখালেখি তখন প্রচলিত ছিল, তিনি তারই অনুবর্তন করতে চেয়েছিলেন। বাংলা কাব্যের মঞ্চে তখন বীররসের দাপাদাপি। একদিকে মাইকেল লিখছেন মেঘনাদবধ কাব্য। অন্যদিকে হেমচন্দ্রের কলমে জন্ম নিচ্ছে বৃত্রসংহার। নবীনচন্দ্র লিখছেন মহাকাব্যিক ট্রিলজি---রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস। মহাকাব্যের বিশাল ক্যানভাস, অসংখ্য চরিত্রের প্রবেশ-প্রস্থান, এপিক-ভার্সের খিলান- বাঁধানো কাঠামোর ফাঁক-ফোকর দিয়ে কবির সঙ্গীতময় ব্যক্তিগত স্বর কখনও যে উঁকি মারত না তা নয়। কিন্তু কোনও এক অলিখিত রীতি অনুসারে তার হাত-পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙা নিষিদ্ধ ছিল। ব্যক্তিগত ভাবনা বা অনুভূতি মহাকাব্যেরই আনন্দ, বিষাদ, দীর্ঘশ্বাস বা গানের মূর্ছনায় আশ্রয় নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করত। নিরালা-নির্জন দুপুরের উঠোনে একলা-গলায় গান গাওয়ার যে আশ্চর্য আনন্দ, মহাকাব্যের অস্ত্র ঝঙ্কারে সেই অস্ফুট ধ্বনি কোথায় গিয়ে মুখ লুকতো, তার হদিশ মেলাই ভার। মধুসূদন তো বলেই ফেলেছিলেন : 'I think I have a tendency in the lyrical way." কিন্তু ওই টেন্ডেনসি বা প্রবণতা পর্যন্তই। মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্যের কাঠামো ছেড়ে ব্যক্তিগত পরিসরে পুরোপুরি ঢুকে পড়ার কথা ভাবতেও পারতেন না কেউ। না মধুসূদন, না হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র, অথবা তাঁদের অনুগামীরা। কাজটা প্রথম করলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। অর্গল ভেঙে, প্রথার বাধা ডিঙিয়ে ঢুকে পড়লেন কাব্যভাবনার এমন এক সবুজ-নির্জন অরণ্যে, যেখানে শুধু তিনি নিজে আর তাঁর আবেগ ও কল্পনার রূপ নির্মাণ।

ফঃ ৫

রোমান্টিক কল্পনার ভিতের ওপর গড়ে ওঠা এই লিরিক বা গীতিকবিতা সে সময়ের বাংলা সাহিত্যজগতে একেবারে নতুন জিনিস। তাঁর প্রথম বই 'সঙ্গীতশতক'-এর কবিতাগুলো যখন লিখছিলেন বিহারীলাল, প্রতিটি কবিতার ভাববস্তু আর আবহের সঙ্গে মানানসই রাগ বা রাগিনী কী দেওয়া যায়, এই চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরে বেড়াত। শুধু রাগ নির্বাচন নয়, সেই রাগের ভিত্তিতে গানের সুর কেমন হবে, ভাবে বিভোর হয়ে তিনি তা খুঁজে বেড়াতেন। ফলে সঙ্গীতশতকের একশটি রচনা একাধারে কবিতা, একই সঙ্গে গানও। শোনা যায়, বিহারীলালের গলায় তেমন সুর ছিল না, কিন্তু সুরবোধ ছিল প্রবল। কোনও গানে চমৎকার এক সন্ধ্যার বর্ণনা। কোথাও বা এক ফুলবাগানের কথা। যেমন পূরবী রাগিনীর একটি গান :

আজি সন্ধ্যা সাজিয়াছে অতি মনোহর
পরিয়াছে পাঁচরঙ্গা সুন্দর অম্বর।
হাসি হাসি চন্দ্রানন, আধ ঘন আবরণ
আধ প্রকাশিত আভা কিবা শোভাকর।

আবার বাহার রাগে আর একটি গীতিকবিতার দু'লাইন :

আজ পূর্ণিমার ভাযে, ফুল ফুটে নাহি হাসে,
করে না মধুর বাসে প্রমোদিত বন।

মনে রাখতে হবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর এমন এক সময়ে ব্যক্তিভিত্তিক এই গানগুলো লেখা হচ্ছে, যখন চারপাশে মহাকাব্য আর আখ্যানকাব্যের ভিড়। মাইকেল মধুসূদন ১৮৬১ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন,--- 'আত্মবিলাপ'— যেখানে কবির ব্যক্তিগত স্বর অনেক বেশি স্পষ্ট। কেউ কেউ বলছেন, মাইকেলের এই কবিতাই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক রীতির প্রথম লিরিক। মাইকেলের সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতায় ব্যক্তি-কবির অনুভব বা কল্পনা অনেক বেশি ডানা মেললেও সনেটের শক্ত কাঠামোর গাঁথনিতে সেসব ঠিক আড় ভেঙে উঠতে পারেনি। সঙ্গীতশতকের গান বা লিরিকগুলো যে অন্যের চেয়ে অনেক আলাদা, বিহারীলাল সেটা জানতেন। নিজের পয়সায় ভাল কাগজে ভাল করে ছাপিয়েও ছিলেন। কিন্তু তেমন পাঠকই পেলেন না। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ কপিও বিক্রি হয়েছিল কিনা সন্দেহ। একটুও দমে যাননি কবি। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল, একদিন না একদিন মানুষ তাঁকে গ্রহণ করবেই। যে-বিশ্বাসের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ছিল তাঁর ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথেরও। কীভাবে বিহারীলালকে আবিষ্কার করলেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ, তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন এক প্রবন্ধে। নাম— আধুনিক সাহিত্য : বিহারীলাল। লিখছেন— ''সে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই ঊষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।''

কেমন সে সুমিষ্ট সুন্দর সুরের নিজস্ব গান? একের পর এক উদ্ধৃতি তুলে এনেছেন মুগ্ধ অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ, সত্যি বলতে কী, কারোর কাব্যকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে এক নাগাড়ে এতগুলো উদ্ধৃতি তুলে আনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও খুব সাধারণ আচরণ নয়। তিনি এতটাই মুগ্ধ ছিলেন বিহারীলালের কবিতায় যে, ''ঝর্ণার ধারে জলশীখরসিক্ত স্নিগ্ধশ্যামল দীর্ঘকোমল ঘনঘাসের মধ্যে দেহ নিমগ্ন'' করে রাখাটাও এক পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় মনে হত। প্রকৃতির সঙ্গে নিজের হৃদয়কে জুড়ে দিয়ে এই যে রোমান্টিক অবগাহন, সেই সময়ের বিচারে এমন কবিতা সবদিক থেকেই আধুনিক। মহাকাব্য নয়, পৌরাণিক উপাখ্যান নয়, আত্মবিভোর বিহারীলাল ''নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।''

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম সার্থক রোমান্টিক কবি বিহারীলালের কাব্যচর্চা কত দূর বিশিষ্ট, সে আলোচনা করা আমাদের অবশ্য উদ্দেশ্য নয়। একশো বছর ধরে তেমন পূর্ণাঙ্গ বা খণ্ডিত আলোচনা অনেক যোগ্য মানুষই করেছেন। যে কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে বিহারীলালের নাম সবচেয়ে বেশি জড়িত, সেই সারদামঙ্গলের দেবী সরস্বতীকে নিয়েও লেখালেখি কম হয়নি। প্রথম লেখক অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখছেন : ''প্রথম যখন তাহার (সারদামঙ্গল) পরিচয় পাইলাম, তখন তাহার আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না। যেই একটু মনে হয় এইবার বুঝি কাব্যরস পাইলাম অমনি তাহা আকার পরিবর্তন করে।... সুদূর সৌন্দর্যস্বর্গ হইতে একটি অপরূপ পূরবী রাগিনী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।...''

অতঃপর আলোচক রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত : ''সারদামঙ্গল একটি সমগ্র কাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হয় না।'' কবির এই সরস্বতী প্রচলিত ধারণা থেকে অনেক আলাদা। বিহারীলালের চোখে কখনও তিনি জননী, কখনও প্রেয়সী, কখনও কন্যা। একটু প্রসারিত করে ভাবলে ইংরেজ কবি শেলির চরাচর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সৌন্দর্য লক্ষ্মীর সঙ্গে বিহারীলালের ওই মরমিয়া সরস্বতীর অনেক মিল। হাল আমলের গবেষক সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার আবার প্রশ্ন তুলেছেন, বিহারীলালের সারদা মৈত্রী-বিরহ, প্রীতি-বিরহ আর সরস্বতী-বিরহের পুঞ্জীভূত রূপ। তিনি একাধারে জায়া, জননী ও কন্যা। অথচ তিনি মা নন, কন্যা নন, সুন্দরী বধূও নন। তবে তিনি কে? তিনি কি ঘরের কোণে নিয়ত ঘুরে বেড়ানো জীবনসঙ্গিনী! নাকি অন্য কেউ!

অপরূপ হাস
আননে বিকাশ,

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ

বার্ষিক সম্মেলন

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের উদ্যোগে আগামী ১৮ মার্চ ২০১৮, রবিবার (সকাল ৮-৩০-বিকাল ৪-৩০) কল্যাণ ভবন, ২৯ ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন স্ট্রিট, মানিকতলা (পোস্ট অফিস সন্নিকট), কলকাতা-৬-এ বার্ষিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনে প্রত্যেক হোমিও চিকিৎসক, ছাত্র ও অনুরাগীদের যোগদানের আবেদন জানাই।

যোগাযোগ
ডাঃ ভাস্কর হাজরা—৯৪৩২৪৬০৪১০
ডাঃ অর্পণ চৌধুরী—৯৬৪৭৬৫৬২৪৫
ডাঃ রাজীব রায়—৯৪৭৪৩৬৫৮১৫

শুভেচ্ছাসহ—
ডাঃ সুকুমার মণ্ডল
সভাপতি

অধর পল্লব অল্প অধীর!
না জানি কেমন
দেখিছ স্বপন
মধুর-মধুর-মুরতি মদির।

সত্যি এ এক কুহক। অতকাল আগে, গীতিকবিতা বা লিরিক সম্পর্কে লেখক আর পাঠকদের মনে যখন স্পষ্ট কোনও ধারণাও দানা বাধেনি, বিহারীলালের কলম থেকে বেরিয়ে আসছে এমনই এক প্রতিমা, যিনি পার্থিব জগত থেকে জন্ম নেওয়া এক মেদুর প্রতীক। যাঁর সর্বাঙ্গে ঝিলমিল করছে হাজারো অর্থ আর ব্যঞ্জনা। স্বপ্নদ্রষ্টা এই কবি কখনও নিঃসঙ্গবোধ করেননি। কল্পলোক আর মাটির পৃথিবী সর্বদা তাঁকে পরিতৃপ্ত করে রেখেছে।

দুই

এমন যাঁর সৃষ্টির ভুবন, সমালোচকের বিরক্তি আর বক্রোক্তি থেকে তিনিও কিন্তু নিষ্কৃতি পাননি। খটকা ছিল রবীন্দ্রনথেরও। বিহারীলালের প্রতিভার উচ্ছ্বসিত বন্দনার পরেও কিছুটা কুণ্ঠিতস্বরে তিনি লিখেছেন : ''বাংলা যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না, সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ ছন্দের ঝংকার এবং ধ্বনি বৈচিত্র্য যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শ্রীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে, এবং হৃদয়কে আঘাতপূর্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না।''

কবি মোহিতলালের সুর আরও এক কাঠি চড়া। সোজাসুজি তিনি বলে দিচ্ছেন : ''বিহারীলালের কবিদৃষ্টি কাব্যদৃষ্টিতে সার্থক হয় নাই। তাঁহার কাব্য একরূপ রসতত্ত্বের আধার হইয়া আছে সে রসকে তিনি রূপ দিতে পারেন নাই; তিনি নিজে যাহা দেখিয়াছেন অপরকে তাহা দেখাইতে পারেন নাই।''

বিহারীলালের কাব্যসৃষ্টিতে কিছু বিচ্যুতি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন এক কাব্যভাষা সৃষ্টি করতে গিয়ে সত্যিই কি বিচ্যুতি এড়ানো সম্ভব ছিল? লিরিক কবিতার গড়ন তখন কাঁচা মাটির তালের মতন। দেশজুড়ে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার নামে যা চলছিল তাতে পরিণত ভাষা বা ছন্দবোধ আশা করাটাই সঙ্গত নয়। একবার দেখে নেওয়া যাক সেকালের বাবুসমাজ আর সাহিত্যশিল্প চর্চার চেহারাটা।

বিহালীলাল যখন কবিতা লেখা শুরু করলেন, তার কিছুদিন আগে থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই বাংলার প্রধান কবি। তাঁর কবিত্ব ছিল অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত। মুখে মুখে গান বেঁধে পাথুরিয়াঘাটার সম্ভ্রান্ত ঠাকুর বংশের যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরদের শোনাতেন। সখের কবির দলেও গান বাঁধতেন ঈশ্বরগুপ্ত। সেকালের সমাজের প্রতিদিনের ঘটনাবলি, বাবুদের ঘুড়ি-পায়রা ওড়ানো বড়লোকি মোচ্ছব— অনেক কিছুই ঢুকে পড়ত স্বভাবকবি ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায়। এরই মধ্যে হাতে এল সম্বাদ প্রভাকর দৈনিক। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন : ''প্রভাকরের কবিতা পড়িবার জন্য বাংলাদেশের লোক পাগল হইয়া উঠিল। প্রভাকর বাহির হইলে বিক্রেতাগণ রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া ওই সকল কবিতা পাঠ করিত এবং দেখিতে দেখিতে কত কাগজ বিক্রয় হইয়া যাইত।''

কিন্তু এত কিছুর পরেও সেকালের রঙ্গব্যঙ্গ ভাঁড়ামোপ্রিয় বাবু সমাজকে পাশ কাটাতে পারেননি ঈশ্বরগুপ্ত। শহরে, গ্রামে, গঞ্জে-গঞ্জে ফি হপ্তায় যে ধরনের কবির কবির লড়াই চলত, সেই লড়াই উঠে এল সাহিত্যের আসরেও। গৌরিশঙ্কর ওরফে গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের রসরাজ পত্রিকার সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের 'পাষণ্ডপীড়নে'র গালাগালি-যুদ্ধ সেকালের বিকৃত রুচির জ্বলন্ত প্রমাণ। অভদ্রতা অশ্লীলতা আর ইতরামির স্রোত বয়ে যেত দু'জনের কাব্যযুদ্ধে। আর লোকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করত সেই ইতর-সাহিত্য। একদিকে ক্ষয়িষ্ণু বাবু-কালচারের ক্যানেস্তারা, অন্যদিকে আবির্ভাব ক্লাসিকাল ঘরানার মহাকাব্য চর্চার, যার প্রধান পুরুষ মাইকেল মধুসূদন এবং পরে-পরেই এলেন হেম-নবীন। আর আখ্যান কাব্যে, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজদের হাত ধরে ইউরোপীয় রোমান্টিক কবিতা তখন কিছু কিছু এদেশে আসছে বটে, কিন্তু তা থেকে রসগ্রহণের প্রস্তুতি বা ক্ষমতা বেশি লোকের ছিল না। কোলরিজ বা বায়রনের অসামান্য সমুদ্র-চিত্র, যা কোন অলক্ষ্যে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে নিঃসঙ্গ মানুষের অবচেতনের বেদনার সঙ্গে। বাংলায় তাকে প্রথম নিজের মতো করে ফুটিয়ে তোলার সাধনা শুরু করেন বিহারীলালই। তাঁর আগে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের রোমান্টিক গীতিকবিতা নিয়ে কেউ কাব্যচর্চার কথা ভাবেনইনি। কারণ, কাহিনি উপেক্ষা করে, চরিত্রদের আনাগোনা উপেক্ষা করে একলা বসে বাঁশির সুরে কবিতার ভুবনকে যে ভরিয়ে তোলা যায়— এই বোধটাই তখনও জন্ম নেয়নি। জন্ম নিল বিহারীলালের কলমে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখছেন : সে যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কতরকমের কক্ষ গবাক্ষ চিত্র মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য।... সেই যে একটি বড় জিনিসকে তাহার নানা কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি তো সহজ নহে।''

অথচ এই বিহারীলাল সম্পর্কেই বারেবারে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তাঁর প্রকাশভঙ্গি দুর্বল, শিথিল। কোনও কোনও শব্দ ব্যবহার রীতিমতো উৎকট। বলা হয়েছে, বিহারীলাল যত বড় 'ঋষি' ছিলেন, তত বড় 'কবি' ছিলেন না। হয়ত অনুযোগগুলো মিথ্যা নয়। প্রকাশভঙ্গির বিশৃঙ্খলা হয়ত অনেক সময়েই অনুভূতিপ্রবণ পাঠককে বিব্রতও করে। কিন্তু তাতে করে কবি হিসেবে তাঁর গুরুত্ব কমে যায় না। খাটো হয়ে যায় না কাব্যচর্চা ইতিহাসে তাঁর ব্যতিক্রমী ভূমিকা।

পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণ দিয়ে আমরা এই লেখা শুরু করেছিলাম। শেষ পর্বেও আবার তাঁকেই স্মরণ করা যায়। বিপিনবিহারি গুপ্তকে বন্ধু-বিহারীলাল প্রসঙ্গে তিনি বলছেন : উনি নিজে যা দেখতেন শুনতেন অনুভব করতেন, দুর্দম প্রবৃত্তির বশে তাদেরই টেনে আনতেন কবিতার অঙ্গনে। সে শব্দ ভাষা হোক, অপভাষা হোক, সংস্কৃত হোক বা অপভ্রংশ— প্রয়োগে দেরি করতেন না। বিদ্যাসাগর যেমন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল থেকে আবৃত্তি করে গদ্‌গদ্ স্বরে বলতেন, দেখো দেখি কেমন ঝরঝরে বাংলা, বেহারীর কবিতা সম্পর্কেও আমরা তেমন বলতে পারি। এমন ঝরঝরে বাংলা বড়ই বিরল। অথচ ভাবগুলো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। ■

পরম্পরা

জাগো নিমাই পণ্ডিত

ড. জিষ্ণু বসু

দোল পূর্ণিমা। ৫৩৩ বছর আগে এই দিনেই নদীয়ার নবদ্বীপে শচীমাতার কোল আলো করে এলেন গৌরাঙ্গ। আজও তাই বাংলার শতসহস্র ঘরে গৌর পূর্ণিমার ব্রত। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভরের ডাকনামটা ছিল নিমাই। তাই নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে খেলে, দৌরাত্ম্য করে বিশ্বম্ভর যখন বড় হলো, লেখাপড়া শিখল, জ্ঞানে গরিমাতে ভারত বিখ্যাত হলেও নদীয়ার লোক তাঁকে নিমাই পণ্ডিতই বলত। তাঁর ভাবনা, শিক্ষা বহু দল, সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে পূর্ব-পশ্চিম দুই বাংলার সমাজের শিরা উপশিরাতে প্রবাহিত হয়েছে। মূল স্রোতের ধর্ম মতের বেড়াজাল ভেঙে আউল, বাউল, ফকির, দরবেশের আখড়াতে অবাধে প্রবেশ করেছে। তাই কোনও মারফতি আনায়াসে গেয়ে ওঠেন, ‘‘ওরে, ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাব না। না, না, ছেড়ে দেব না।’’ বিশ্বসাহিত্যের অনন্য খনির বৈষ্ণব রসসাহিত্যের রসরাজ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। উত্তর ভারতে ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। তার প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক পথের পথিক হতে, মন প্রাণে ‘কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা’ মাখতে ভারতে আসেন পৃথিবীর সবকটি মহাদেশের মানুষ। আসেন কৃষ্ণাঙ্গ ভক্ত, আসেন শ্বেতাঙ্গ ভক্ত। সারা পৃথিবীর মানব সভ্যতার ইতিহাসে আবহমানকাল ধরে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে নদীয়ার নবদ্বীপের ছেলে যুগপুরুষ নিমাই পণ্ডিতের নাম।

নিমাই পণ্ডিত বলতেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চুয়া চন্দন উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। সৌম্য, সুঠাম দেহ, গভীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, উন্নত শির এক পণ্ডিত। সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেধা আর প্রজ্ঞার সামনে নতমস্তক ভারতের তাবড় পণ্ডিত সমাজ। কিন্তু সে পণ্ডিত কেবল যাগযজ্ঞ, পূজা পাঠ, অধ্যয়ন করা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ নয়, সে আসলে এক যোদ্ধা। সমাজে পচাগলা মমির মতো জড়িয়ে থাকা কুসংস্কার, ধর্মের নামে পাপাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অকুতোভয় এক দক্ষ সেনাপতি। চোখ বুঝলে যেন বারবার সেই দৃশ্যটাই মনে পড়ে, নদীয়ার ঘাটের থেকে বহুদূরে নিজে নৌকা বেয়ে নিয়ে এসে গঙ্গাবক্ষে বিয়ে দিলেন হতভাগিনী চুয়াকে, বণিক চন্দনের সঙ্গে। তবু যেন নতুন দম্পতির মনে সন্দেহ, ভয়। শরদিন্দুর ভাষায়, ‘‘নিমাই পণ্ডিতের নাসা স্ফুরিত হইল, তিনি গর্বিতস্বরে বলিলেন, নিমাই পণ্ডিত যে বিয়ের পুরুত, সে বিয়ে অমান্য করে কে?’’ এত দৃপ্ত, এত প্রত্যয়, এই সাহস থাকে এক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের? এমন বীরকেই তো হাজার

বছর ধরে পূজা করে একটা জাতি!

১২০২ সাল থেকে শুরু করে ১৮৯৩, এক অন্ধকারময় সময়। বক্তিয়ার খিলজির কাছে পরাজিত বাংলা সত্যি সত্যি কলকাতার নরেন্দ্রনাথ দত্তের শিকাগো জয়ের মধ্যেই উঠে দাঁড়ালো। এর মধ্যের সময়ের ঘন অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বলতম আলোকবর্তিকা নিমাই পণ্ডিত। একথার মানে নিশ্চয়ই এটা নয় যে এঁরা ছাড়া আর কেউ নেই যাঁরা বাংলার সভ্যতা সংস্কৃতির জন্য অবদান রেখেছেন।

কিন্তু চুয়া চন্দনের সেই সৌম্যকান্তি, সুপুরুষ, ধীরদত্ত যুবক নিমাই, যে অনায়াসে ৮/১০ ক্রোশ উজানে দাঁড় টেনে যেতে পারতেন, লক্ষ্মী, বিষ্ণুপ্রিয়ার মতো আরও কত সুন্দরী শ্রেষ্ঠা তাঁকে বরণ করার জন্য সেদিন অধীর ছিল, ভারতবর্ষের কত রাজসভায় তাঁর জন্য রাজ পণ্ডিতের আসন পাতা ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ রসেবসে থাকা এক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সুপুরুষ, এত ভোগ, এত ঐশ্বর্যের প্রলোভন পায়ে ঠেলে মস্তকমুণ্ডন করে বের হয়ে গেলেন। কিন্তু কেন?

বাংলার শেষ সার্বভৌম হিন্দু রাজা সিলেটের গৌর গোবিন্দ। আফ্রিকার ইয়েমেন থেকে আসা এক সুফি পির শাহ জালালের প্রতারণার শিকার হলেন রাজা গৌড় গোবিন্দ। আজও সিলেটের বন্দরবাজার, বিশ্বনাথ উপজেলার গৌর গোবিন্দ দুর্গের সামনে দাঁড়ালে এখনো সে বেদনা প্রাণে বাজে। বিশ্বম্ভর মিশ্র বা নিমাই পণ্ডিতের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের মূল বাড়ি ছিল শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণে। ছোট্ট নিমাই তাই স্বাভাবিক ভাবেই মালিয়া ছড়া, বিশ্বনাথ, বন্দরবাজার বা ঢাকা দক্ষিণে কীভাবে প্রতি মুহূর্তে হিন্দুরা অপমানিত, নির্যাতিত হয়েছে, প্রতিনিয়ত কীভাবে একের পর এক ধ্বংস হচ্ছে শ্রীহট্টে মন্দির সংস্কৃত শিক্ষার পাঠশালাগুলি, কেনই বা মিশ্র পরিবারকে আসতে হল তেরো নদী পার হয়ে নদীয়ার নবদ্বীপে—এই সব দুঃখ-গাথা বাড়িতে অবশ্যই শুনেছেন। প্রখর বুদ্ধির নিমাই সেইসব শুনেছেন আর তাঁর ধর্মসংস্কৃতির বিপদের কথা বুঝেছেন।

শ্রীচৈতন্যের সমকালীন ভারতবর্ষ বা শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত হিন্দুদের দুর্দশা নিমাই পণ্ডিত থেকে শ্রীচৈতন্য হিসেবে প্রকাশের মধ্যে কতটা প্রভাব ফেলেছিল? কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত', বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবৎ', লোচন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল'-এর মতো বাংলা জীবনী সাহিত্যে অথবা কবি কর্ণপুরার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতম্ মহাকাব্যম্ বা মুরলী গুপ্তের কৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্তমের মত সংস্কৃত ভক্তি সাহিত্যে কতটুকু উল্লেখ আছে? উল্লেখ অবশ্যই আছে, তবে ওইসব শক্তিশালী সাহিত্যকারদের উপস্থাপনা আজকের ভাবনার নিরিখে বিচার করলে সঠিক হবে না। এইসব মহাপ্রাণ সেযুগের প্রয়োজনে হিন্দু ভক্তদের সংগঠিত করার জন্য ঠিক যেভাবে চৈতন্য চরিত্র প্রকাশ করা প্রয়োজন ছিল তাই করেছেন। তাছাড়া ভক্তি আন্দোলন প্রসারের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা ছিল তাঁদের ভাবনার মূল সূত্র। ইতিহাস বর্ণনায় দায়বদ্ধতা তাঁদের ছিল না। কিন্তু আজকের আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবনার যুগে শ্রীচৈতন্যের নিমাই পণ্ডিত থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়ে ওঠার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা প্রয়োজন। কী অসাধ্যসাধন সেযুগে নিমাই পণ্ডিত করেছিলেন, তা আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা না করলে আজকের বাংলার মানুষ হয়তো পৃথিবীর মানচিত্র থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সেই ভাবনা থেকেই এই রচনার অবতারণা।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তখন দুটি ঘটনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যার গজপতিরাজ প্রতাপরুদ্র দেবের লড়াই। সেইসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের সঙ্গে গজপতিরাজের লড়াইটাও একই সময়ে ঘটেছিল। হিন্দু রাজাদের মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ কলহ নিমাই পণ্ডিতকে পীড়া দিয়েছিল। ঠিক তেমনই গজপতি রাজাদের পরাক্রম তাঁকে দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যিক প্রতিরোধের কার্যক্ষেত্র নির্ণয়ে সাহায্য করেছিল। ১৫১০ সালে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ওড়িশা এলেন, তখন নীলাচলের মহারাজা গজপতি ভূপতি প্রতাপরুদ্র দেব তাঁকে গুরুর আসনে বরণ করে নিলেন।

হিন্দু সমাজের অপরিসীম দুর্দশা আর সনাতন দর্শন ও সংস্কৃতিকে বঙ্গভূমিতে টিকিয়ে রাখার উদগ্র আর্তি নিশ্চয়ই নিমাই পণ্ডিতকে সর্বদা ভাবাত। তিনি কায়মনোবাক্যে এই জাতিকে বাঁচানোর কোনও উপায়ের অন্বেষণ করছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের জন্য গয়াতে গিয়ে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনের সময়ই যেন সমাধানের সূত্র পেলেন। ভারতবর্ষের যেসব ক্ষণজন্মা মনীষী মধ্যযুগের ভীষণ সময়ে সমাজকে পরিত্রাণের পথ দেখিয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই এমন অলৌকিকভাবে পরমেশ্বরের আদেশ নির্দেশ পেয়েছিলেন। আর সকলের চিন্তা ভাবনার বাইরে একেবারে মৌলিক সমাধানের পথ দেখিয়েছিলেন। তাদের ওই যুগান্তকারী পথনির্দেশের জন্যই পৃথিবীর বিস্ময় হয়ে স্বমহিমায় বেঁচে আছে ভারতবর্ষ। সারা পৃথিবীতে যেখানে যেখানে ইসলাম পৌঁছেছে তা প্রাচ্যের মেসোপটেমিয়াই হোক বা আফ্রিকার মিশর—মাত্র একশো বছরের মধ্যে

সেখানকার পুরাতন সভ্যতা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। সেখানকার মানুষের পরিচয়ে সংস্কৃতিতে প্রাচীন সভ্যতার চিহ্নটুকু নেই। ব্যতিক্রম কেবল ভারতবর্ষ—সারা পৃথিবীতে একমাত্র ব্যতিক্রম। আর সেই ব্যতিক্রমের নেপথ্যের মহাপুরুষরা হলেন শ্রীচৈতন্য, গুরু গোবিন্দ সিংহের মত ক্ষণজন্মারা।

গুরু গোবিন্দ সিংহ শেষগুরু, এরপর সবাই বান্দা। একটি মাত্র পবিত্র গ্রন্থ, পঞ্চ ক কার ধারণ একেবারে প্যারামিলিটারি ব্যবস্থা। সেদিন বেঁচে গিয়েছিল পঞ্জাব। ঠিক তেমনই বাংলাকে বাঁচার পথ দিলেন নিমাই পণ্ডিত। বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করে ফিরে এলেন নিমাই। একেবারে অন্য মানুষ। নবদ্বীপ গেয়ে উঠল 'জাগনি গো শচীমাতা, গৌর আইল প্রেম দাতা, ঘরে ঘরে হরিনাম বিলায় রে।' এই ঘরে ঘরে হরিনাম দেওয়ার পদ্ধতিই ওই যুগপুরুষের আবিষ্কার। সাল বোধ হয় ১৫০২। পৃথিবীর সর্বপ্রথম গণআন্দোলন। একেবারে তৃণমূল স্তরের মানুষকেও জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি রক্ষার পাঠ দেওয়া। অহিংস শক্তিকেন্দ্র তৈরি করা। শ্রীচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ আর হরিদাসকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার থেকেই তাঁর লড়াইয়ের মানসিকতা পরিষ্কার বোঝা যায়। বললেন, "যাও ভাই, নগরের পথে পথে, প্রতি ঘরের দরজায় দরজা যাও, যাকে পাবে তাকেই বল হরিনাম করতে আর দিনের শেষে সন্ধ্যায় আমাকে বল তার কী ফল পেলে!" অসংগঠিত, নিরস্ত্র একটি জাতিকে এক ধ্বনি, এক মন্ত্র দিয়ে সংগঠিত করা আর ক্রমবর্ধমান শক্তির অনুভব নিয়ে নেতৃত্বের বিকাশ। অসাধারণ কাজ হল নিমাই পণ্ডিতের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারে।

জাতিভেদের কুফলেই হিন্দু সমাজকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। তাই লড়াই করতে গেলে সবচেয়ে আগে কুড়োল মারতে হবে জাতিভেদের গোড়ায়। সেটা পরিষ্কার বুঝেছিলেন নিমাই পণ্ডিত। দলিত, অন্ত্যজকে মান দেওয়া, সম্মানের সঙ্গে বুকে টেনে নেওয়া জাদু দেখাল। এই বুকে টেনে নেওয়ার মধ্যে কোনওরকম ভণ্ডামী ছিল না, ছিল না কোনও তঞ্চকতা, ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসার অমোঘ টানে স্ববর্ণ, অন্ত্যজ, অহিন্দু মুসলমানকেও কাছে টেনে আনল। তাঁর শিষ্য হলেন রূপ, সনাতনের মত উচ্চপদস্থ হুসেন শাহের রাজদরবারের কর্মচারী।

এই শক্তিবৃদ্ধির স্বাভাবিক পরিণাম উঠে এল। নবদ্বীপের এই গণআন্দোলনে মুসলমান শাসক প্রমাদ গুনল। চাঁদ কাজি এক সন্ধ্যায় শ্রীবাস আচার্যের বাড়িতে গেলেন। লাথি মেরে ভেঙে দিলেন খোল। বলে গেলেন এই সংকীর্তন যদি বন্ধ না করে তবে শ্রীবাসকে সপরিবারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে।

মহাপ্রভূর যেন হিসেবের মধ্যেই ছিল এই আক্রমণ। নিমাই পণ্ডিত সেদিন বীর যোদ্ধা। অহিংস অসহযোগের মাধ্যমে সত্যাগ্রহের প্রথম পাঠ পেল ভারতবর্ষ। সন্ধ্যার আঁধার নামতেই নিমাই পণ্ডিতের ডাকে জড়ো হল শতশত সত্যাগ্রহী। হাতে জ্বলন্ত মশাল, চোদ্দটি দলে ভাগ হয়ে গেল সংকীর্তনকারীরা। গন্তব্য কাজির বাড়ি। যে পদ্ধতিতে তিনি সমাজকে রক্ষা করলেন, সেটাও কিন্তু তার অধীত পথ ছিল না। তিনি ছিলেন পণ্ডিত, প্রজ্ঞবান মানুষ। তাই ভক্তিমার্গ, জনগণের সঙ্গে মিলে একাত্ম হওয়াতে তিনি অভ্যস্থ ছিলেন না। তিনি একাধারে বাধ্য ছাত্রের মত অদ্বৈত আচার্যের মতো বৈষ্ণব গুরুদের কাছে শিখেছেন। শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর বাড়িকে কেন্দ্র করেই তাঁর নতুন কাজ শুরু হল। সন্ন্যাস নিলেন গুরু কেশব ভারতীর কাছে থেকে। সারা ভারতবর্ষ পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর মতো ঘুরলেন তিনি। এই পর্বটিও তাঁর শিক্ষারই এক বড় অংশরূপে পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়। সমাজের ভয়, দুর্দশা, অক্ষমতা বিষয়ে সম্যক ধারণা ছিল বলেই হয়তো মহাপ্রভু পরবর্তী ক্ষেত্রে একেবারে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সারা পৃথিবীতে খুব কমই উদারহণ আছে যে, একজন মানুষ একটি জাতিকে পাঁচশো বছর ধরে অনুপ্রাণিত করেছেন, পথ দেখিয়েছেন। এমন সরল পদ্ধতি তিনি দেখালেন যে, সমাজের সব মানুষ, সব ভেদাভেদ ভুলে অংশ নিতে পারে। আজ মনে হয় 'সংকীর্তন' আবিষ্কার বা সংকীর্তনের প্রভাব উপলব্ধি নিমাই পণ্ডিতের এই জাতিটার প্রতি এক মৃত সঞ্জীবনী মহৌষধী।

আজকের ব্যবস্থা-বিজ্ঞান বা ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সে একটা বহুল প্রচলিত শব্দ রিইঞ্জিনিয়ারিং। যে ব্যবস্থা আছে তার খোল নলচে পালটিয়ে এক নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। রাজার কাজ দেশ শাসন করা আর সন্ন্যাসীর কাজ সমাজের মানুষের মধ্যে আত্মিক উন্নতি ঘটিয়ে অতিন্দ্রিয় চেতনা জাগ্রত করা। ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মের এই চিরাচরিত ধারণা ভেঙে দিয়েছিলেন মহাপ্রভু। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনই হিন্দু জীবনের মূল লক্ষ্য। সবরকম উপাসনা, মঠ-মন্দির, উপাচার ওই একটি গুহ্যকথাকে ঘিরে আছে। তাই হিন্দু ভক্ত আর ভগবান, জীব আর ব্রহ্ম—এই একের সঙ্গে একের সাধনার পদ্ধতি রপ্ত করা শেখায়। তাই এত বড় বড় পাহাড়ের মতো মন্দিরের আসল স্থান গর্ভগৃহ—একেবারে ছোট্ট একটা প্রকোষ্ঠ। সেখানে কেবল ভক্ত আর

ভগবান। তাই হিন্দুর ধর্মাচারণে সমবেত উপাসনার জায়গা প্রায় ছিল না। ভক্তি আন্দোলনের যুগেই হিন্দু এই সমবেত ধর্মাচারণ শিখল। আর সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছে অবশ্যই শ্রীচৈতন্যের মাধ্যমে। এই অসাধারণ সাফল্য যেমন বাংলার মাটিতে, ঠিক তেমনই ওড়িশার মাটিতেও। বাংলায় অসহায়, অত্যাচারিত, হীনবল হিন্দু সমাজ চাঁদ কাজির পরাজয় দেখে বহু শতাব্দী পরে জয়ের স্বাদ পেল। তেমনই উড়িষ্যার যুদ্ধে ক্লান্ত মহাপরাক্রমশালী গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র দেবও বুঝলেন যে, সারা ভারতে প্রথাগত সামরিক শক্তি দিয়ে একদিকে বাংলার আবদুল্লা হুসেন শাহ অন্যদিকে বাহামণি সুলতান শাহির হুসেন ভেইরির সঙ্গে লড়ে যাওয়া খুব বেশিদিন সম্ভব হবে না। বরং সাধারণ মানুষের জাগরণ প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ নিজের দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সভ্যতা ও ধর্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করুক। রাজা প্রতাপরুদ্র সব অভিমান ছেড়ে লুটিয়ে পড়লেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে।

এমন অসামান্য সাফল্যের জন্য চাই অসম্ভব আত্মবিশ্বাস। আজকের ব্যবস্থা-বিজ্ঞানের ভাষায় বললে বলা যায় এর তিন স্তর—কনসিভ, বিলিভ অ্যান্ড অ্যাচিভ। প্রথম পর্ব কনসিভ। একেবারে নতুন ধারণা মনে আনা। পরাজিত, লাঞ্ছিত জাতিকে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে জাগরিত করা সম্ভব, এটা তিনি মনের মধ্যে কনসিভ বা জন্ম দিয়েছিলেন। এর পরের পর্ব বিলিভ বা বিশ্বাস করা। অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু অধীত বিদ্যা, উপলব্ধ সত্যের উপর অটুট বিশ্বাস। সত্যি বলতে কী হরিনাম সংকীর্তন ইত্যাদি নিমাই পণ্ডিতের ‘কাপ অব টি’ মানে অভ্যাসলব্ধ বিষয় ছিল না। সেটা বোঝা যায় নবদ্বীপে শ্রীবাস গোঁসাইয়ের ঘরে নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাসকে নিয়ে একাদশীর দিন হরিবাসর স্থাপন থেকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে সংকীর্তনের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে। পণ্ডিত, তাত্ত্বিক নিমাই এই রেজিমেন্টালাইজেশন শিখেছেন। এই রেজিমেন্টালাইজেশন বা অনুশাসনবদ্ধ সমবেত কার্যক্রমের উপর অটুট বিশ্বাস নিমাইকে শক্তিশালী করেছে। আর সবশেষে, অ্যাচিভ, ‘প্রাপ্য বরান্ নিবোধত’ মানে যা মনস্থির করেছি তাকে সফল করা। এই রেজিমেন্টাল ফোর্স, সমাজের এই সংগঠিত শক্তি, নিরস্ত্র গণদেবতার কাছে হেরে গেল চাঁদ কাজি। সেটাই অ্যাচিভমেন্ট বা সাফল্যের শুরু, নিমাই পণ্ডিতকে আর কখনও ফিরে তাকাতে হয়নি।

স্বাভাবিক কারণেই গত পাঁচশো বছরে এই অজেয় শক্তির শক্তিক্ষয় হয়েছে। কোথাও জাতিভেদ, কোথাও অর্থহীন আচারসর্বস্বতা বা কোথাও বা নিখাদ স্বার্থসিদ্ধি এই মহাপুরুষের যুগান্তকারী আবিষ্কারের মূলধারা থেকে হয়তো একটু আধটু বিভ্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এত কিছুর পরেও এই মহামন্ত্রই জাতিটাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। শ্রীচৈতন্যের পরেও বহু আঘাত এসেছে সমাজের উপর। মহাপ্রভুর তিরোধানের মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বাংলার মুঘল সুবেদার সুলেমান কর্রানির সেনাপতি কালাপাহাড় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় অগণিত হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেছে। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, বহু সহস্র হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ শেষ হয়ে যায়নি। সমাজের তাচ্ছিল্য, অপমান সহ্য করে দেশ, ধর্ম, সমাজের প্রতি এই কর্তব্য পালন লাগাতার করে চলেছে। তথাকথিত শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী সমাজ ‘নদের নিমাই’ বলে ব্যঙ্গ করেছে। প্রগতিশীল চিত্র পরিচালক ‘ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ’ নিয়ে কুরুচিকর ব্যঙ্গাত্মক সঙ্গীত বানিয়েছেন এই সেদিন পর্যন্ত। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ মুখ বুজে সেবা দিয়ে গেছেন, প্রয়োজনে বুকের রক্তটুকু দিয়েও ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যেদিন ফরিদপুর লুঠ করতে এল খানসেনারা, সেদিনও খোল-করতাল নিয়েই নাম সংকীর্তনে বের হয়েছিলেন প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রমের শ্রীঅঙ্গন মঠের বাবাজিরা। ওই নিরস্ত্র ধর্মযোদ্ধাদের হৃদয়ে বিশ্বাস ছিল মহাপ্রভুর দেওয়া সেই হরিনাম জগতের সর্বশক্তিকে পরাস্ত করতে সমর্থ। সেদিন শ্রীঅঙ্গন আশ্রমের চালতাতলা ওই মহাপ্রাণদের রক্তে ভেসে গিয়েছিল। ওই ৯জন সন্ন্যাসী প্রাণ দিয়েছিলেন, হারেননি। জিতে গেছে ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতি। হের গিয়েছিল খান সেনা। স্বাধীন হয়েছিল বাংলাদেশ। তেমনই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গোচরণ থানার খাকুড়দহ শ্মশানের পাশে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠ, সেখানে সন্ন্যাসী ছিলেন হরিদাস বাবাজি। ১৯৯৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সকালে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল বাবাজিকে। হরিদাস বাবাজির একমাত্র অপরাধ ছিল তিনি মৌলবাদীদের চাপের কাছে মাথা নোয়াননি, বন্ধ করেননি অষ্টপ্রহর সংকীর্তন। বন্ধ করবেন কীভাবে? পাঁচশো বছর আগে মহাপ্রভু যে বলে গেছেন, এই হরিনামে বিশ্বজয়ের জাদু আছে। কোন অত্যাচারের কাছেই মাথা না নোয়ানোর জাদু!

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পরে খুব সামান্যই লিখেছেন। তাঁর মূল শিক্ষা ছিল তাঁর পূতপবিত্র মহাজীবন। শ্রীশ্রী শিক্ষাষ্টকম্ তাঁর বিরচিত অন্যতম পুস্তক। মাত্র আটখানা সূত্রে বিধৃত সামনের শতাব্দীগুলিতে কী করতে হবে। জাতপাত, আচার সর্বস্বতার বেড়াজাল কাটানোর মন্ত্র তিনি তৃতীয়

শ্লোকেই দিলেন।
''তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা। আমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।। ৩।।

একদম সহজ সরল সোজাসাপটা নির্দেশ। কেউ চেষ্টা করেও এর বিশেষ বিকৃতি ঘটাতে পারবে না। ''তৃণ অপেক্ষাও নীচু হয়ে, বৃক্ষের মত সহিষ্ণুতা দেখিয়ে, নিজে অমানী হয়ে পিছিয়ে পড়া, মানুষকে সম্মান দিয়ে সদাসর্বদা হরিকীর্তন করবে।''

এই কাজে সর্বক্ষণের সংসার বৈরাগী ভক্ত প্রয়োজন। মানব সমাজ বিশ্বপ্রকৃতির অংশ। নারী-পুরুষের প্রেম, গৃহ, সংসারই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলে। সেই গার্হস্থ্যই জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। প্রাচীন ঋষিরা বলেছেন এই চক্র স্বাভাবিক, নিন্দনীয় কখনোই নয়। শ্রীচৈতন্য এই 'আন অ্যাভয়েডেবল ইভিল', বা 'অপরিহার্য দোষ' সমাজ রক্ষার জন্য স্বীকার করেছিলেন। চতুর্থ শ্লোকে বললেন,
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।৪।।

'হে জগদীশ! আমি ধন বা জন অথবা সুন্দরীভার্যা কিংবা সালঙ্করা কবিতা প্রভৃতি কিছুই কামনা করি না। হে ঈশ্বর, তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।'

এই বিষয়েও মহাপ্রভূর রেজিমেন্টালাইজেসন বা অনুশাসন ছিল উল্লেখ করার মতো। এ প্রসঙ্গে ছোটা হরিদাসের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ছোট হরিদাস তার থেকে বড় এক গৃহিণীর আহ্বানে কিছুক্ষণ বসেছিল। মহাপ্রভূ এই কথা শোনার পরে হরিদাসকে তাঁর কাছে আসতে বারণ করে দিলেন। লজ্জায় আপমানে ছোট হরিদাস আত্মহত্যা করে। এই হৃদয় বিদারক ঘটনা শোনার পর রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর এমনকী নিত্যানন্দ প্রভুও মহাপ্রভুকে একবার দেখতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। মহাপ্রভূ যাননি। পুরীধামে পরমানন্দ পুরীজীকে মহাপ্রভূ গুরুজ্ঞানে ভক্তি করতেন। এবিষয়ে সন্ত পরমানন্দ বলতে এলে, মহাপ্রভূ সবিনয়ে বললেন, '' প্রভূ, তাহলে হয়তো আমার আর এখানে থাকা হবে না।'' কোনও কিছুতেই গলেনি সেই কঠোর হৃদয়। কিন্তু মহাপ্রভূ তো প্রেমময়। বলা হয় ভগবান কৃষ্ণে প্রেম আর রাধার অনুরাগ এক দেহে মিলেছিল গৌরাঙ্গের দেহে। তবে কারণ একটাই, যুদ্ধ জয়ের জন্য যে শৃঙ্খলা প্রয়োজন সেখানে মহাপ্রভূ ছিলেন কঠিন কঠোর। আজমল খাঁয়ের মতো, কালাপাহাড়ের মতো নিষ্ঠুর নরসংহারকারীদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য তরুণ যুববাহিনী তৈরি করছিলেন মহাপ্রভূ। গনগনে আগুনে পোড়ানো ঝকঝকে ইস্পাত।

আজ ঢাকা দক্ষিণ থেকে নবদ্বীপে আবার সেই হাহাকার। বিগত পঞ্চাশ বছরে অত্যাচারে, লুণ্ঠনে, ধর্ষণে ২২.৫ শতাংশ থেকে কমে কমে ৮.৯৬ শতাংশ হয়ে গেছে বাংলাদেশ বা পূর্বপাকিস্তানের হিন্দু সংখ্যা। গত দুই বছরে এমন কোনও মাস যায়নি, যে মাসে শ্রীহট্ট বা ব্রাহ্মণবেড়িয়া জেলায় একজন না একজন হিন্দু আক্রান্ত হয়েছে, নিহত হয়েছে বা লুণ্ঠিত হয়েছে। নদীয়া জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার জুড়ান পুরে ভূমিহীন প্রান্তিক চাষি মারু হাজরার পরিবারের ৪ জনকে ২০১৫ সালের ৪ মে দিনের আলোয় খুন করা হলো কেবল হিন্দু হওয়ার অপরাধে। সেই মহাপ্রভুর জেলা নদীয়ার হাঁসখালিতে ২০১৬ সালের নবমীর রাতে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারল সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতীরা। কষ্টে, জ্বালায় কাতরাতে কাতরাতে দশদিন পরে মারা গেল ১৭ বছরের মেয়ে মৌ রজক। বলা হচ্ছে, অপরাধের সন্ত্রাসের কোনও ধর্ম হয় না। কিন্তু হিন্দু অত্যাচারিতে হলে, খুন হলে, ধর্ষিতা হলে চুপ করে থাকাটাই প্রগতিশীলতার দস্তুর। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের এই পাপাচার বাংলার মুসলমান সমাজকে কাছে টানছে না। কেবল মৌলবাদকে, জেহাদি সন্ত্রাসকেই সহায়তা করছে।

আজ বাংলার নদী, মাঠ, গ্রাম, নগর তোমাকেই চায় নিমাই পণ্ডিত! তোমার আবির্ভাবের দিকেই তাকিয়ে আছে লক্ষ লক্ষ জনগণ। কোটি ক্লান্ত, বিষণ্ণ চোখ তোমাকেই খোঁজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে, আই টি সেক্টারে, যুবভারতীর মাঠে তোমাকেই ফিরে পেতে চায়। আজকে পরিস্থিতি ভয়ানক। খাগড়াগড়, কালিয়াচক—প্রতি মুহূর্তে ঘাড়ে উষ্ণ নিঃশ্বাস। কিন্তু ১৫০০ সাল পরাধীন, দলিত, মথিত, অত্যাচারিত এক জাতি, যার বিচার পাওয়ার কোনও আশাই ছিল না, ছিল না হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, জাতিসঙ্ঘ—একবার ভাবো আজকের অবস্থা কি তার থেকেও খারাপ? তোমাকে দিয়ে কী হবে? সেটা বিচার করতে বসে সময় অপচয়ের সময় আর নেই। বরং ভাবো এই দেশের জন্য, এই সমাজের জন্য, সংস্কৃতির জন্য, কামদুনির আর হাসখালির মৌ রজকের জন্য আজ তোমার কী করা উচিত? জাতিভেদ বা অর্থনীতি আচার সর্বস্ব ধর্মের ধ্বজাধারীদের বীভৎসতা আজকে রাজনীতি ব্যবসায়ীদের চেয়ে কম ভয়ানক ছিল না। তবু তুমি জিতেছিলে নিমাই পণ্ডিত। ঈশ্বরের কোনও মহৎ কাজের ভার আছে বলেই আশ্চর্যজনকভাবে বাংলাতে এখনো শ্রীরাম, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতরা টিকে আছেন। তাই জয় আমাদের হবেই। তুমি হরিবাসর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সংকীর্তনে বের হও। জাগো নিমাই পণ্ডিত, জাগো! ■

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
26 February - 2018 - Rs. 10.00

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০্ টাকা ।।